# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্য লেখক

Issue cover not available


Vol. 12 | No. 1 | 1968



Check for updates



| | |
|---|---|
| Volume | 12 |
| Issue | 1 |
| Year | 1968 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | কাজী আবদুল মান্নান |
| Published online | June 15, 1968 |
| DOI | 10.62328/sp.v12i1.2 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v12i1.2 |
| Pages | 35-72 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্য লেখক

কাজী আবদুল মান্নান

প্রচলিত ধারণায় মীর মশাররফ হোসেনকেই আমরা আধুনিক গদ্য সাহিত্যের প্রথম মুসলমান লেখক মনে করি। তিনি হয়ত এখন পর্যন্ত প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমান গদ্য সাহিত্যিক, কিন্তু মুসলমানদের গদ্যরচনার ইতিহাস তাঁকে দিয়েই শুরু হয় নি। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে আমরা তাঁরও আগে কয়েকজন গদ্য লেখককে পাচ্ছি। এঁরা হচ্ছেন : খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী, মুন্সী আজিমদ্দীন, মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন, সেখ আজিমদ্দী এবং আয়েন আলী শিকদার।

## *প্রথম গদ্য রচনা*

খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম মুসলমান লেখক এবং তাঁর রচিত 'উচিৎ শ্রবণ' মুসলমান সাহিত্যিকের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। ১৩৫৭ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক' নামে এক প্রবন্ধে[১] সিদ্দিকী ও তাঁর গ্রন্থ 'উচিৎ শ্রবণ' সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই ও জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেবদ্বয় রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে, খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক এবং তাঁর 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থটিকে মুসলমান রচিত গদ্যের প্রথম নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, গ্রন্থটি কোন্ সময় রচিত হয়েছিল বা কখনও ছাপা হয়েছিল কিনা, সে কথা তাঁরা সঠিক বলতে পারেন নি। তাঁদের খবর : ১২৭১ সালের মাঘ মাসে, ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের এক পূর্বপুরুষ, মুন্সী বশারতুল্লাহ গ্রন্থটি নকল করেন।

১। "ছাত্রী সংঘ বার্ষিকী" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৭।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী 'ভাবলাভ' ও 'গুরতজান' নামে দু'খানা কাহিনীকাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ আবদুল হাই-সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩৬৪ সালের বর্ষা সংখ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 'উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে, সিদ্দিকীর কবিকর্মের বিস্তৃত পরিচয় দেন। তিনি 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থের বা সিদ্দিকীর গদ্য রচনার কোন উল্লেখ করেন নি। তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সিদ্দিকী মধ্যযুগের ধারা অনুসরণ করেই কাব্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর আদর্শ ছিল কবি ভারতচন্দ্র। ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে ( ঢাকা, ১৯৬৪ ) 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থের একটি অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। অন্যত্র তিনি 'উচিৎ শ্রবণে'র ভাষাকে 'অত্যন্ত সুললিত, মার্জিত, সুন্দর' বলে প্রশংসা করেছেন[১]। আমরা এখানে বইটির বিষয়বস্তু ও ভাষার বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করবো। তা থেকে বোঝা সহজ হবে যে, এর ভাষা 'অত্যন্ত সুললিত, মার্জিত, সুন্দর' অথবা ধর্মের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যার কষ্টসাধ্যপ্রয়াসের দ্বারা এর গদ্য জটিল ও আড়ষ্ট।

'উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার্থিক ভাব' গদ্য পদ্যে রচিত গ্রন্থ।

গ্রন্থে লেখক নিজের নাম লিখেছেন—'বর্দ্ধমান নিবাসি খোন্দকার শ্রী সমছদ্দিন মহম্মদ সিদ্দিকি।' বইটি ১৮৭২ শকাব্দে 'চিৎপুর রোডব টতলা ২৪৬ নং ভবনে' বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২ ( ডিমাই সাইজ ) এবং এর দাম রাখা হয়েছিল ছয় আনা।

'শ্রীশ্রী হবিব' দিয়ে বই শুরু হয়েছে এবং সূচনায় আছে 'গান ভজন'

ঐ নামে বন্দনা বন্দি বল কে পারেরে। যে
জন করিল সৃষ্টি অসার সংসারেরে। প্রকাশিল
দিবা নিশি. সৃজন করিল শশী, তপন কিরণে
জিনি হরে অন্ধকারে রে যং দেখ তার লীলে
শক্তি কার মুখে বলে, কলমেরি শক্তি কিবা
প্রকাশিবে তারেরে

১। 'সাহিত্য পত্রিকা' মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, ঢাকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৩১৮।

মধ্যযুগের কাব্যের রীতি অনুসরণ করে, লেখক পদ্যে আল্লাহ্ এবং নবীর বন্দনা করে, তার পুস্তকের মহিমা এবং এ পুস্তক পাঠের সুফল ব্যক্ত করেছেন :

প্রথম আরম্ভ করি নামেতে তাঁহার।
যে জন দয়ালু দয়া করণ তাহার॥
পরে তার নবিজীর বন্দনা বন্দিয়ে।
লিখিতেছি কোন কথা শুন মন দিয়ে॥
ধর্ম্মের লাগিয়ে মর্ম্ম করি বিচরণ।
রাখিলাম নাম পুথি উচিৎ শ্রবণ॥
প্রিয়জনে প্রয়োজন যখন হইবে।
উচিৎ শ্রবণ মোর উচিৎ দেখিবে॥
ওহে ওহে প্রিয়গণ শুন দিয়া মন।
মোছলমানি ধর্ম্ম বড় অমূল্য রতন॥
এই রত্ন ধনে যত্ন যে জন করিবে।
বিধির বন্ধুর মধ্যে তাহারে গণিবে॥
ভবেতে হইবে তার মহত প্রচার।
পরকালে হইবে তার স্বর্গ অধিকার॥

কবিতায় গ্রন্থের মহিমা প্রকাশ করার পর লেখক গ্রন্থ পাঠের সুফল ব্যক্ত করেছেন গদ্যে—"কখনো কখনো সকালে সন্ধে অবকাশ মতে মনো আকিঞ্চন দ্বারায় মনোযোগ হইয়া অত্র পুস্তকের দুই এক গল্প যাহা পাঠ করিতে অল্প হয় দৃষ্ট করিলেই অতি অবশ্যই কল্পতরু হইবার সম্ভাবনা রসনার দ্বারায় ঘোষণা করিলেই বাসনা পূর্ণ হয়, আর যাঁহাকে দৃষ্ট বলা যায় তাঁহাকে বিলক্ষণ রূপে নিরক্ষণ করিলেই অত্র পুস্তকের মধ্যে যে সকল বচন রচন হইয়াছে অমূল্য রতন জ্ঞানে যতন করিলেই শারীরিক পত্তন ও পতনের মর্ম্ম ও নিরঞ্জন আরাধন ধর্ম্ম আর যে সকল উচিত কর্ম্ম তাহা সকল হইতে জ্ঞাপন হইবে।"

গ্রন্থের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করার পর সিদ্দিকী অনিশ্চিত মানবজীবনের মূল্যহীনতাকে ব্যক্ত করেছেন পয়ার ছন্দে। তিনি ইহকালের মিথ্যামোহ পরিহার করে, পরকালের ভাবনা ভাবতে বলেছেন। নিজের মনকে হুঁশিয়ার করে তিনি বলেন :

এক্ষনেতে মন মোর দুষ্টতা ছাড়িয়া।
সাধন সেবন কর সরল হইয়া॥
নিশিমত কেশ বেশ আঁধার আছিল।
এবে নিশি ঘুচে শশী উদয় হইল॥
অর্থাৎ আছিল কেশ মুটিল কোমল।

পাকিয়ে সোনের মত হইল প্রবল ॥
তথাচ না হৈল মন বশে আপনার।
মাতালের মত দেখি চরিত্র তোমার ॥
গত হৈল দেখ মন চল্লিশ বৎসর ।
বালক চরিত্র তবু নাহি গেল তোর ॥

মনের কাছে তাঁর প্রশ্ন : পরকালে কি করিবে উত্তর কি দিবে।
পরিত্রাণ কিসে পাবে কিসে মুক্ত হবে ॥...

তিনি জানেন : ঘর দ্বার পরিবার সকল ছাড়িয়া
একদিন যেতে হবে দেখ বিচারিয়া ॥......
কেবল যাইবে সঙ্গে করণ আপন।
হয়তো পাপের ভোগ নহে পুণ্যধন ॥
ভবের বাজারে যে রে পুণ্যধন লবে।
পরকালে প্রভুস্থানে পরিত্রাণ পাবে ॥

কাজেই লেখক মানুষকে পরোপকারী ও দানশীল হওয়ার পরামর্শ এবং অহঙ্কার বর্জন করার উপদেশ দিয়েছেন। গ্রন্থে তিনি 'উপকারীর কথা' ও 'দানের কথা' বলেছেন পয়ারে এবং অহঙ্কারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন গদ্যে। তাঁর ভাষায় 'অহঙ্কারের দ্বিতীয় অবস্থা' হচ্ছে—"প্রথম জাতি ও কুল দ্বিতীয় বুদ্ধি ও বিদ্যা প্রথম অবস্থার ব্যবস্থা এই যে আমি অমুক মুনি, কিম্বা সাধুর সন্তান বলিয়া আপন আদর বাড়াইতে হয় বিচার করিয়া দেখো ইহা বিনা মূল্যে পুরাতন অস্থি বিক্রয় করিয়া কেবল মান বাড়ান ইহার জন্য আমাদের নবিজী রছুলুল্লা আপন কন্যা বিবি ফাতেমা জহুরাকে নিষেধ করিয়াছেন যে হে মা, ফাতেমা আপন মনে এমত অহঙ্কার করিও না, যে আমি রছুলের কন্যা সাধন কর সাধন কর সাধিলেই সিদ্ধ হইবে। হে মন। আমার তুমি বিবেচনা কর যে স্থানে রছুলের কন্যা ও হজরত আলীর বণিতা ও এমাম হাছেন ও হোছেনের মাতা এবং যাহার পদবি খাতন যেন্নত অর্থাৎ স্বর্গীয় বিবি তিনি অহঙ্কার করিলেও করিতে পারেন তাঁহাকে যখন নিষেধ করিয়াছেন তখন আমার অহঙ্কার করা কেবল বুদ্ধির ত্রুটি এবং পাপ।" 'অহঙ্কারের তৃতীয় বিধান' দিয়েছেন তিনি গদ্যে এবং পদ্যে। ধনের জন্য, রূপের জন্য, শক্তির জন্য মানুষকে তিনি অহঙ্কার প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'পরমেশ্বরের বন্ধুত্ব'। লেখকের ভাষায় "বন্ধুতা পরমেশ্বরের বন্ধুতা......এই বন্ধুতা সেই করে যে ব্যক্তি মরণের পূর্বে মরে,

চরিত্র তাহার কেবল বিচার বিচারেতে পেয়ে মর্ম্ম সদাই করে সেই কর্ম্ম, ধর্ম্ম হয় তাহার ফলে বিধি মত, সকলে বলে এক্ষণে বাখানি, শুন তার কাহিনী, ভয় নাহি চিত্রে ( চিত্তে ? ) তার লোভ নাহি রাখে আর এই ধ্যান করে মনে কেমনে পাই নিরাঞ্জনে সেই তো মোর জন্মদাতা জগতের তিনি কর্ত্তা ভুলিতে কি তাহায় পারি যার আমি আজ্ঞাকারী সন্ধানে তার কোথায় যাবো কোথা গেলে তারে পাবো হৃদয় ভুবনে বসি এই চিন্তা দিবা নিশি যে ব্যক্তি উক্তি করিয়া শক্তি মত আরাধনা আশে সাধনে বৈসে সেই ভক্ত শক্ত হইল, প্রেমের অঙ্কুর সেই করিল, তাহার পরে তপস্যা দ্বারে প্রেমের সাগরে ডুবিয়া ডুবারু হইয়া প্রেমধন অমূল্য রতন যতন পূর্ব্বক উঠাইয়া আপন ইচ্ছার থলি পরিপূর্ণ করিল।"

'পরমেশ্বরের বন্ধুত্ব' লাভের পন্থা হিসাবে সিদ্দিকী সাধন পদ্ধতির বিচিত্র বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে সাধনের মূল পন্থা বা 'মোকাম' চারটি—"প্রথম সরিয়তে যাহাকে মোকাম নাছুত বলা যায় দ্বিতীয় মোকাম তরিকত যাহাকে মলকুত বলা যায় তৃতীয় মোকাম হকিকত যাহাকে যবরূত বলা যায়, চতুর্থ মোকাম মারফৎ তাহাকে লাহুত বলা যায় এই চারি মোকামের কিঞ্চিৎ বিধান সন্ধান মত দেওয়া যাইতেছে।" এরপর লেখক প্রত্যেকটি 'মোকামের' বর্ণনা এবং উক্ত 'মোকাম' হাসেলের দুরূহ পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, যেমন—"প্রথম মোকাম যাহাকে নাছুত বলা যায় সে স্থানে অগ্নি আছে আর রবির কিরণ তাহাতে জ্যোতির্ময় আর আজরাইল ফেরেস্তা তথাকার প্রহরি এবং দৃষ্টিকার ঐ মোকামের অগ্নি হইতে দেহের নির্ণয় অর্থাৎ পত্তন ও মেকাদ অর্থাৎ গুহ্যের দ্বারে যে তিনখানি অস্থি অর্থাৎ হাড় আছে তাহার ভিতরে এক গত্ত আর ঐ গত্তের মধ্যে কালো রঙ্গের একটি অগ্নির তারা আর ঐ তারা হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় ঐ অগ্নি হইতে সর্ব্বদা ধন্ধকার এবং ধূঁয়া উঠিতেছে আর ঐ ধূঁয়া হইতে নিদ্রা ও অলস হয়, আর অগ্নির তাবতীয় তেজ পিত্তিতে প্রবর্ত্ত, আর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ও বীর্য্য অর্থাৎ অঙ্কুর ও সর্বাঙ্গের বল ও শক্তি ঐ অনলের তাপে হইতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ অনল বলবান থাকে, আয়ুত অর্থাৎ জীবন, মৃত্যুকালে প্রথমেই অনলের তেজ দেহমধ্যে থাকে না, আর ঐ মোকামের দুই কর্ণ দুই দ্বার যদি কেহ উক্ত মোকামের সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তবে ঐ মেকাদের ভিতরে উপরোক্ত স্থানে ঐ তারাকে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ জ্ঞান করিয়া ধ্যানের নয়নে দীপ্তমান দেখিতে থাকেন, সাধন ঠিক হইলেই প্রেম উত্থাপন হইবেক, তখন আপন হৃদয়কে নিরাঞ্জন

সিংহাসন জ্ঞান করিয়া রিপুগণকে ধিৎকার দিয়া সাধন দ্বারায় জব্দ করেন, আর ঐ মোকাম সাধন সময় আকিঞ্চন পূর্ব্বক প্রকাশিত গুরুর রূপকে ধ্যান নয়নে সম্মুখে রাখিয়া আপন দেহের বামভাগে, লা, দক্ষিণভাগে (এলাহা) হৃদয়মাঝারে এল-লেল্লাহ নয়বার সাধনের ধেঁাকিতে ধঁকিয়া একবার (মহম্মদ রছুলোল্লা) বলেন এইমত প্রকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারে সাধন করিতে থাকেন এই সাধনের নাম যেক্‌রে জলি অর্থাৎ যেকরে সরিয়ত জানিবেন।"

সাধন পদ্ধতির কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়ে, সিদ্দিকী 'উচিৎ শ্রবণ' সমাপ্ত করেছেন। কবিতার দ্বারা গ্রন্থের সূচনা করে তিনি কবিতা দিয়েই গ্রন্থের ছেদ টেনেছেন :

ওহে ওহে বন্ধুগণ শুন দিয়া মন।
হইল সমাপ্ত পুঁথি উচিৎ শ্রবণ॥
যথার্থ তাহার মর্ম্ম জ্ঞাপন হইয়া।
সাধন করিবে সবে বিরলে বসিয়া॥
চারি মোকামের কথা কেতাবে দেখিয়া।
সংক্ষেপেতে লিখিলাম সাধন লাগিয়া॥
কেতাবে দেখিলে কিছু না হয় সাধন।
সাধন সেবন হয় মজাইলে মন॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে মন আকায় দিয়ে।
ময়রার মত ভিয়ান কর ধ্যান লাগায়ে॥
পাপ নষ্ট কাষ্ঠ জ্ঞানে জ্বালাইবে তারে।
মন ভ্রান্ত কাটো গাদ রসনার দ্বারে॥
ঝাঁজরা করে রসনারে কেটে ফেল গাদ।
কাটিলে মনের গাদ বাড়িবে আহ্লাদ॥

সর্বশেষে 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থের মধ্যে যে 'পঞ্চউচিতের' সমাবেশ হয়েছে তাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন,—"এই পুস্তক মানবে দেখা উচিৎ ও শ্রুত উচিৎ এবং পরমার্থিকভাবে বুঝিতে উচিৎ যিনি বুঝিবেন গোপনে রাখা উচিৎ ঐহিকভাবে বুঝা অনুচিৎ এই পঞ্চ উচিতে সমাপ্ত।"

গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি গান দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সুর ও তালের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—'মধ্যমান ঠেকা আড়া' 'ঝিঁজিট' 'খেমটা' 'আড় খেমটা,' 'রেক্তা' ইত্যাদি। কয়েকটি গান ব্রজবুলি এবং হিন্দি ভাষায় লেখা। এখানে আমরা দুটি গান উদ্ধৃত করলাম।

লটকি নটওা বাজী গরনে কেয়াহি বাজী
মারাবে। রঙ্গ বেরঙ্গ কি খেলন হারা
ভেলকি ওস্কি নেয়ারাবে॥
ভানমতি কি খেল কিছি, খেলন হারা খেলে
ওয়ছী, আপহি খেলে, আপহি বোলে,
আপহি দেখন হারাবে॥
আপনৈমে ও আপহি আবে, আপনে সোর
কো আপহি গাবে, রাজী হেয় ও মরজী উপর
মরজী ওস্কি সারাবে॥

২

দাতা দেনে ওয়ালা দে মাওলা মেরে।
তুনে দিয়া হ্যায় ছব কুহ যো কুছ হামারে॥
আপন প্রেম পর অনুরাগী, তোহরে ইচ্ছা
মোরা ভাগী, দরশন কারণ নয়ন বানায়া
নয়ন মেরে দরশন তেরে।
ছিদ্দীকি ছোর ছারে গামা নিছা পরি নিছা
পামা, হ্যায় তু মেরে প্রিয়তমা,
তু হ্যায় মেরে মেয় হোঁ তেরে।

আশা করি উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থের পরিচয় থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে, 'উচিৎ শ্রবণে'র বিষয়বস্তু পরমার্থিক। এ গ্রন্থের প্রথমাংশে সিদ্দিকী মানুষকে কতকগুলি ধর্মাচরণের উপদেশ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়াংশে অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই সাধনপদ্ধতি সুফী সাধনার অনুরূপ এবং যোগ সাধনার সঙ্গেও তার কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে এ-কথা কোনভাবেই বলা যায় না যে, 'বইটিতে যোগশাস্ত্রের আলোচনাই প্রধান'।[১] গ্রন্থের মধ্যে ধর্মের গূঢ় রহস্য এবং সাধনপদ্ধতির দুরূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, লেখক এর ভাষাকে জটিল এবং আড়ষ্ট করে ফেলেছেন। গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভাষা অবশ্য সহজতর, তবে কী গদ্য কী পদ্য কোন জায়গার ভাষাই ''অত্যন্ত সুললিত, মার্জিত, সুন্দর' নয়।

'উচিৎ শ্রবণ' বইটি সুদুর্লভ। ফলে, ইচ্ছে থাকলেও সুধী পাঠক এটি পড়বার সুযোগ পান না। হয়ত সে কারণেই অনেক সময় গবেষকদের অসতর্ক মন্তব্য এ ধরণের গ্রন্থ সম্পর্কে, পাঠকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই আমরা

১। 'সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৩১৭।

সিংহাসন জ্ঞান করিয়া রিপুগণকে ধিৎকার দিয়া সাধন দ্বারায় জব্দ করেন, আর ঐ মোকাম সাধন সময় আকিঞ্চন পূর্ব্বক প্রকাশিত গুরুর রূপকে ধ্যান নয়নে সম্মুখে রাখিয়া আপন দেহের বামভাগে, লা, দক্ষিণভাগে ( এলাহা ) হৃদয়মাঝারে এল-লেল্লাহ নয়বার সাধনের ধেঁাকিতে ধঁকিয়া একবার ( মহম্মদ রছুলোল্লা ) বলেন এইমত প্রকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারে সাধন করিতে থাকেন এই সাধনের নাম যেকুরে জলি অর্থাৎ যেকরে সরিয়ত জানিবেন।"

সাধন পদ্ধতির কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়ে, সিদ্দিকী 'উচিৎ শ্রবণ' সমাপ্ত করেছেন। কবিতার দ্বারা গ্রন্থের সূচনা করে তিনি কবিতা দিয়েই গ্রন্থের ছেদ টেনেছেন :

ওহে ওহে বন্ধুগণ শুন দিয়া মন।
হইল সমাপ্ত পুঁথি উচিৎ শ্রবণ॥
যথার্থ তাহার মর্ম্ম জ্ঞাপন হইয়া।
সাধন করিবে সবে বিরলে বসিয়া॥
চারি মোকামের কথা কেতাবে দেখিয়া।
সংক্ষেপেতে লিখিলাম সাধন লাগিয়া॥
কেতাবে দেখিলে কিছু না হয় সাধন।
সাধন সেবন হয় মজাইলে মন॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে মন আকায় দিয়ে।
ময়রার মত ভিয়ান কর ধ্যান লাগায়ে॥
পাপ নষ্ট কাষ্ঠ জ্ঞানে জ্বালাইবে তারে।
মন ভ্রান্ত কাটো গাদ রসনার দ্বারে॥
ঝাঁজরা করে রসনারে কেটে ফেল গাদ।
কাটিলে মনের গাদ বাড়িবে আহ্লাদ॥

সর্বশেষে 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থের মধ্যে যে 'পঞ্চউচিতের' সমাবেশ হয়েছে তাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন,—"এই পুস্তক মানবে দেখা উচিৎ ও শ্রুত উচিৎ এবং পরমার্থিকভাবে বুঝিতে উচিৎ যিনি বুঝিবেন গোপনে রাখা উচিৎ ঐহিকভাবে বুঝা অনুচিৎ এই পঞ্চ উচিতে সমাপ্ত।"

গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি গান দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সুর ও তালের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—'মধ্যমান ঠেকা আড়া' 'ঝিঁজিট' 'খেমটা' 'আড় খেমটা,' 'রেক্তা' ইত্যাদি। কয়েকটি গান ব্রজবুলি এবং হিন্দি ভাষায় লেখা। এখানে আমরা দুটি গান উদ্ধৃত করলাম।

লটকি নটওা বাজী গরনে কেয়াহি বাজী
মারাবে। রঙ্গ বেরঙ্গ কি খেলন হারা
ভেলকি ওস্কি নেয়ারাবে॥
ভানমতি কি খেল কিছি, খেলন হারা খেলে
ওয়ছী, আপহি খেলে, আপহি বোলে,
আপহি দেখন হারাবে॥
আপনৈমে ও আপহি আবে, আপনে সোর
কো আপহি গাবে, রাজী হেয় ও মরজী উপর
মরজী ওস্কি সারাবে॥

২

দাতা দেনে ওয়ালা দে মাওলা মেরে।
তুনে দিয়া হ্যায় ছব কুহ যো কুহ হামারে॥
আপন প্রেম পর অনুরাগী, তোহরে ইচ্ছা
মোরা ভাগী, দরশন কারণ নয়ন বানায়া
নয়ন মেরে দরশন তেরে।
ছিদ্দীকি ছোর ছারে গামা নিছা পরি নিছা
পামা, হ্যায় তু মেরে প্রিয়তমা,
তু হ্যায় মেরে মেয় হোঁ তেরে।

আশা করি উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থের পরিচয় থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে, 'উচিৎ শ্রবণে'র বিষয়বস্তু পরমার্থিক। এ গ্রন্থের প্রথমাংশে সিদ্দিকী মানুষকে কতকগুলি ধর্মাচরণের উপদেশ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়াংশে অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই সাধনপদ্ধতি সুফী সাধনার অনুরূপ এবং যোগ সাধনার সঙ্গেও তার কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে এ-কথা কোনভাবেই বলা যায় না যে, 'বইটিতে যোগশাস্ত্রের আলোচনাই প্রধান'।[১] গ্রন্থের মধ্যে ধর্মের গূঢ় রহস্য এবং সাধনপদ্ধতির দুরূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, লেখক এর ভাষাকে জটিল এবং আড়ষ্ট করে ফেলেছেন। গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভাষা অবশ্য সহজতর, তবে কী গদ্য কী পদ্য কোন জায়গার ভাষাই "অত্যন্ত সুললিত, মার্জিত, সুন্দর' নয়।

'উচিৎ শ্রবণ' বইটি সুদুর্লভ। ফলে, ইচ্ছে থাকলেও সুধী পাঠক এটি পড়বার সুযোগ পান না। হয়ত সে কারণেই অনেক সময় গবেষকদের অসতর্ক মন্তব্য এ ধরণের গ্রন্থ সম্পর্কে, পাঠকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই আমরা

১। 'সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৩১৭।

এখানে গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করলাম। আমাদের দেশে এ-ধরণের দুর্লভ উপাদান সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব বলেও, আমরা এ কাজটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে জ্ঞান করি।

মানুষের পরমার্থিক মুক্তির পথ নির্দেশ করার ইচ্ছে নিয়েই খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থ রচনা করেন। সমাজ সচেতনতা বা বাস্তবতাবোধের কোন পরিচয় এ-গ্রন্থে নেই। এতে তৎকালীন সাধু বা পোষাকী রীতিতে লেখা গদ্যের নিদর্শন আছে। কিন্তু সে ভাষাও বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত বা তারাশঙ্করের হাতে যে ঔৎকর্ষলাভ করেছিল, সিদ্দিকী তাকে যথার্থ-ভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি। হয়ত পুস্তকের বিষয়বস্তু তার জন্য কিছুটা দায়ী। ধর্মের গূঢ় রহস্য এবং সাধন পদ্ধতির কঠিন রীতি বুঝাতে গিয়ে, লেখক 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থের ভাষাকে জটিল, আড়ষ্ট এবং অনেকক্ষেত্রে দুর্বোধ্য করে ফেলেছেন। বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে যে সচেতনতা আধুনিক সাহিত্যের একটি বড় কথা, সে-পরিচয় আমরা পাই কিছু পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে। এ ব্যাপারে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, কে প্রথম সমাজ-সচেতন মুসলমান লেখক। আমরা প্রায় একই সময়ে কয়েকজন মুসলমান লেখককে পাচ্ছি, যাঁরা তাঁদের চারপাশের মানুষের জীবনকে চিত্রিত করেছেন। এঁদের পুস্তকের গদ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথ্য রীতিকে অনুসরণ করেছে। এঁরা প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের বাসিন্দা। অনুমান করা যায় যে, এঁদের পুস্তকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের মুখের ভাষার নিদর্শন বিধৃত হয়েছে।

সিদ্দিকীর পর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমরা দু'জন মুসলমান গদ্য লেখককে পাচ্ছি। এঁরা হচ্ছেন, মুন্সী আজিমদ্দীন ও মুন্সী নামদার।

### *নক্সা-প্রহসন*

মুন্সী আজিমদ্দীন রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লণ্ডনে ব্রীটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পুস্তিকার নাম হচ্ছে, 'কি মজার কলের গাড়ি'। এটী ১৮৭৫ শকাব্দে (১৮৬৩ খৃঃ) 'শ্রী কাজী সফিউদ্দীনের আদেশানুসারে কলিকাতা গরণহাটা ষ্ট্রীটে ৯২ নং ভবনে এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে মুদ্রিত' হয়। পুস্তিকার সাইজ

৬$\frac{1}{2}$"×৪" এবং মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪, দাম রাখা হয়েছিল এক আনা। পুস্তিকার প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় একটি ট্রেনের ছবি ছাপা হয়েছে। ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে যাত্রা শুরু করেছে।

'কি মজার কলের গাড়ি' পুস্তিকায় লেখক ইংরেজ দেশে রেল গাড়ী চালু করেছে বলে, তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং যুবতী বধূরা এর দ্বারা কিভাবে উপকৃত হয়েছে তার কৌতুকপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

পুস্তিকার শুরুতে একটি সাহেব প্রশস্তিমূলক গীত। তার 'রাগিণী হাবড়ার ঘাট। তাল শিয়ালদহের মাঠ।' আজিমুদ্দীন বলেন ঃ

বানিয়েছে রেল রোডের গাড়ী ধন্য সাহেব কারিকর।
এখন বিশ্বকর্ম্মার পূজা ছাড় ঐ সাহেবের পূজা কর॥

বউরা ঘরের কাজ ফেলে রেলগাড়ী দেখার জন্য 'পাঁদাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্বাশুড়ী বিরক্ত হন। তাদের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয় ঃ

"শাশুড়ী। বলি ওগো বয়েরা, তোরা কি পাঁদাড়ে দাঁড়িয়েই থাকবি গা? ঘরে কি আর কর্ম্ম নেই, বাপের বয়েসে কখন গাড়ী দেখিসনি নাকি।

বউ। হেঁ বাবু আমরাই না হয় দেখিনি, তোমার বাপ বড় দেখেছে তা কৈ, আই ঠাকরোণকে জিজ্ঞাসি যাই দেখি কেমন তোমার বাপ কলের গাড়ী দেখেছে।"

'আই বুড়ী' বউদের সঙ্গে রসালাপ করেছে। সে বলে ঃ 'এখন তোদের অদৃষ্টক্রমে ইংরেজ বাহাদুরেরা কল বানিয়েছেন, সেই কলেতেই সকল কল চলছে।' রেলগাড়ী হয়ে কর্তারা 'নিত্তিনিত্তি' বাড়ী আসে। আইবুড়ী তার যৌবনের স্মৃতি মনে করে আক্ষেপ করেছে। তার স্বামী থাকতো বিদেশে। দেশে রেল গাড়ী ছিল না। স্বামী 'ন মাসে ছ মাসে' একবার বাড়ী আসতো। দীর্ঘ পথ হেঁটে আসতেই ছেলের বয়েশ যেতো'। শুধু কি তাই, এখন রেলগাড়ী হয়ে বউদের মান বেড়ে গেছে। এখন 'পুরুষরা আর মেয়েদিগকে কিছু রুষ্ট বাক্য বলতে পারে না।' কারণ এখন 'ঘর কত্তে টকঝক হলে পরে অমনি চুপ করে তাড়াতাড়ি পরে সাড়ি, চেপে গাড়ি, মায়ের বাড়ী উপস্থিত হন।' বউঝিরা নানা ছলছুতা করে গাড়ী দেখতে যায়, সাহেবদের মহিমা কীর্তন করে ঃ

কি কল বানালে কল কলে চলে কল।
দেখে কলে অঙ্গ টলে হাসে খল খল॥
কেহ বলে ওগো দিদি কে বানালে কল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কি সে দেখে আসি চল।

এমন হিতাষী কল দেখী নাই দ্রহে।
সতী পতি নিত্য পায় যার অনুগ্রহে ॥
কেহ বলে নাগো দিদি দেবতা তো নয়।
বিলাতের পতি তিনি দেবতারি প্রায় ॥

রেল গাড়ী হয়ে পতির গৃহে আগমন সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে, সতীরা খুব খুশী হয়েছে। কিন্তু 'অসতী ধনীরা' উপপতিদের সঙ্গে প্রেম বিলাসে বিঘ্ন ঘটেছে বলে, বিলাপ করেছে ঃ

"যুবতী। ওহে প্রাণ নাথ। বলি এখন বাড়ী যাও হোথা মাথা খেয়েছে যে, গাড়ী আসচে কি জানি সে মুখ পোড়া যদি এসে পড়ে।"

রচনার শেষে লেখক কবিতায় নিজের পরিচয় দিয়েছে ঃ

বিরচিত আজিমদ্দীন জেলা বর্দ্ধমান।
খাঁড়ি নামে আছে ধাম মেমরির দক্ষিণে ॥

মুন্সী আজিমদ্দীন "জামাল নামা" নামে একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটিও পূর্বোক্ত প্রেস থেকে ছাপা হয়। এটির টাইপ এবং ছাপার রীতি দোভাষী পুথির মত এবং এর বিষয়বস্তু রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। কিন্তু এর ভাষা দোভাষী নয়। আজিমদ্দীন বলেছেন যে, তিনি পারসী কাব্য অনুসরণে চলতি বাংলায় তার গ্রন্থ রচনা করেছেন ঃ

পারসির কেতাব ছিল মজমুন ইহার।
ছলিছ বাংলায় আমি করিলাম প্রচার ॥

গ্রন্থ রচনার তারিখ দিয়েছেন ঃ

"সন ১২৬৬ সালের দিবস রবিবার।
১১ আশ্বিন মাহা তারিখ ইহার॥'

তাহলে, "কি মজার কলের গাড়ী" পুস্তকটি প্রকাশের চার বছর আগে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "জামাল নামা" কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির সাইজ ৭½ × ৪½ এবং মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা চুরানব্বই।

কাব্যের শুরুতে তিনি বর্ণিত বিষয়ের একটি বিবরণ দিয়েছেনঃ "মগরব তরফে ছিলেন বাদসা নামদার। নামেতে জোহাক সাহা বাড়া নেককার॥ গোলবানু নামে কন্যা ছিলো তার ঘরে। কিরূপে জামাল কাজি লইয়া গেলেন হরে॥ জেছুরাতে জঙ্গলেতে সাদি করে ছিল। জেরূপে সে গোলেবানু মরিয়া

বাঁচিলো ।। জেছুরাতে হেন্দ পোষ চুরি কৈল তারে। জে প্রকারে মুছা নবি বদদোওয়া করে ।। জেছুরাতে দুই জোনে হয় বনবাসি। জেরূপেতে তেজে প্রাণ সেই যে রূপসী ॥ জেছুরাতে ফকির হইল দুই জোন। কেতাব মাফিক আমি লিখি বিবরণ ।। অধীন নাচার কহে আজিমদ্দীন নাম। করিম রহিম আল্লা পুরাও মনস্কাম।"

কাব্যের ভাষাকে জনপ্রিয় দোভাষীর মত করার চেষ্টা আছে বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতবহুল শব্দ সমন্বয়ে বাক্য গঠন করা হয়েছে। কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণ এবং মুরলির উপমা আছে, বিরহিনীর 'বারোমাস্য বর্ণনা' আছে। কাব্যের শেষে লেখক তাঁর পরিচয় একটু বিস্তারিতভাবেই দিয়েছেন: "এই হুর্দ্দ পুথি মেরা হইলো তামাম। মুন্সী আজিমদ্দীন নাম খাঁড়োতে মোকাম।। জেলা বর্দ্ধমান মধ্যে মেমরির দক্ষিণ। কাদিমি ফকির খানা জানায় অধীন ।। নানাজি জারুল্লা কাজি ছিলেন আমার। জেন্নত নছিব খোদা করিল তাঁহার। দাদাজি ছিলেন তিনি নামে ওস্মার আলি। জেন্নতে দাখিল হন সে বোজোর আলি। গোলাম ছরওয়ার কেবলা নামেতে আমার। তাঁহার কদম তলে আমি গোনাগার ॥"

মুন্সী নামদার অনেকগুলি ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁর ১১ খানা পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি লণ্ডনে ব্রীটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। পুস্তিকাগুলি নক্সা জাতীয় এবং পয়ার ছন্দের কবিতা ও কথ্যরীতির গদ্যে রচিত। ডক্টর সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মুন্সী নামদারের পাঁচটি বইএর উল্লেখ করেছেন এবং বইগুলি আসলে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুমান করেন যে, 'মুন্সী নামদার' ভোলানাথের ছদ্মনাম[১]। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি এতবড় সন্দেহের জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। আমাদের মনে হয়, মুন্সী নামদারের বইগুলি তিনি পড়ে দেখলে, তাঁর মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হোত না। লেখক বই-গুলিতে তাঁর নিজের এবং বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাংখীদের পরিচয় নিম্নলিখিত-ভাবে দিয়েছেন:

১। ডঃ সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস," দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃষ্ঠা, ১০৭।

১। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ" পুস্তকে তিনি বলেন ঃ

রচে হীন কবিকার নামে নামদার।
বালিয়া ভূপতিপুরে বসতি আমার।

২। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "দুই সতীনের ঝকড়া" পুস্তকে তিনি বলেন ঃ

বালিয়া ভূপতিপুরে বাস নামে নামদার।
রচিয়া এসব কথা করিনু প্রচার ॥

৩। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ননদভাজের ঝকড়া ও বাঞ্ছারামের গল্প" পুস্তকে লেখক বলেন ঃ

আবশ্যক ছিল নাই পুস্তক লিখিতে।
জমীরদ্দীর কথা কেবল না পারি টলিতে ॥

৪। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা" পুস্তকে নামদার বলেন ঃ

দশখানা পুস্তক আমি করিনু রচন।
জমীরদ্দীর তরে আমি কৈনু সমর্পণ ॥
ইহার মোহর ছাড়া কেহ যদি ছাপেন।
আইন মাফিক সেই দাবিতে আসিবেন ॥

এ-বইএ প্রকাশক জমীরদ্দী নিজের পরিচয় এবং নামদারের প্রশংসা করে তাঁর রচিত পুস্তকের একটি তালিকা দিয়েছেন ঃ

জমিরদ্দী নাম মোর বন্দিপুরে ঘর।
নামদার নামে এক বন্ধু যে আমার ॥
বড়ই উপকারী তিনি বড়ই হিতৈষী।
তাঁহার গুণের কথা করিব প্রকাশি ॥
প্রথমে সমর্পণ মোরে করেন হায়রে ঝড়।
তার পরে ষোল কলা দুই সতীনের লড়॥
পরে লিখিয়া দিলেন আকাল ও সুকাল।
এক্ষণেতে লিখে দেন শিয়াল রাজার হাল ॥

৫। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "খেদের গান" পুস্তকে লেখক বলেন ঃ

লিখিতে পুস্তক মম নাহি ছিল মনে।
একান্ত কারল জেদ দুই বন্ধু জনে ॥
মুন্সী এয়াছিন আর হিঙ্গ ভাই জান।...
আর আএনঙ্গী নাম সুখে রাখ ভায় ॥
আমার পক্ষেতে তিনি বড় উপকারি।
একত্রেতে থাকি মোরা একি কর্ম্মচারী ॥

৬। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী" পুস্তকে তিনি বলেন ঃ

নামেতে ওম্মেদ আলি বড় নেককার।
এ পুস্তক লিখি আমি ফরমাসে তাঁহার ॥
সেখ ওম্মেদ দোস্ত মম অনুগ্রহ করি।
কলির বউ ঘর ভাঙ্গা ছাপ শীঘ্র করি ॥

উপরোক্ত বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, মুন্সী নামদার বালিয়া পরগণার ভুপতিপুরের বাসিন্দা ছিলেন[১]। তিনি 'আএনঙ্গী' নামে এক বন্ধুর সঙ্গে একত্রে বাস করতেন এবং এক জায়গায় চাকরী করতেন। তাঁকে পুস্তক রচনার জন্য প্রেরণা দিতেন, 'মুন্সী এয়াছিন আর হিঙ্গ ভাইজান'। বন্ধু 'জমিরদ্দীর' অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, তিনি বই লিখতে বাধ্য হন এবং তাঁর উপরেই প্রকাশের, ভার দেন। তাঁর শেষ বইটি তিনি লেখেন 'দোস্ত' সেখ ওম্মেদ আলির 'ফরমাসে'।

বোধ করি এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে একত্রে বাস করতেন যিনি, যাঁর পুস্তক রচনার প্রেরণা দান করতেন মুসলমান বন্ধুরা এবং যাঁর পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব অর্পিত হোত মুসলমান প্রকাশকের ওপর তিনি নিজেও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নন।

মুন্সী নামদার সম্পর্কে আর একটি সন্দেহ যে, এটি সম্ভবত 'হাড়জ্বালানীর' লেখক গোলাম হোসেনের ছদ্মনাম। এ সন্দেহের কারণ, 'কলির বউ হাড়জ্বালানী' নামে একটি পুস্তিকা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, 'মুন্সী নামদার প্রণীত' বলে প্রকাশিত হয়। বইটি 'শ্রী সেখ জমীরদ্দীর অনুমত্যানুসারে কলিকাতা চিৎপুর রোডে ৩৩৩ নং ভবনে শ্রীকাশীনাথ শীলের জ্ঞানদ্বীপক যন্ত্রে শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত' হয়। গোলাম হোসেনের 'হাড়জ্বালানী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। এ বই-টিতে প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা দেওয়া হয়েছে,—'শ্রী সেখ জমিরদ্দী সাং বন্দিপুর, জেলা হুগলী, থানা হরিপাল'। বই দুটির বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনা এক কিন্তু লেখক ও প্রকাশক ভিন্ন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোলাম হোসেন ও মুন্সী নামদার একই ব্যক্তি কিনা এবং যদি তাঁরা এক ব্যক্তি না হন তাহলে, এটি আসলে কার

১। বালিয়া পরগণা বৃহত্তর বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে এটি হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অঞ্চলে (অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে) মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চার একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। দোভাষী সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ফকির গরীবুল্লাহ বালিয়া পরগনার হাফিজপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

রচনা। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' বইএ মুন্সী নামদার বলেছেন যে, তিনি 'দশখানা পুস্তক' রচনা করে জমীরদ্দীকে প্রকাশ করার জন্য দিয়েছেন। এ বইএ জমীরদ্দীও নিজেকে বন্দিপুরের বাসিন্দা বলেছেন। কাজেই গোলাম হোসেনের 'হাড়জ্বালানীর' প্রকাশক ও এই জমীরদ্দী একই ব্যক্তি। তা হলে একই প্রকাশক 'হাড়জ্বালানী' বইটি গোলাম হোসেনের নামে এবং অন্য বই-গুলি মুন্সী নামদারের নামে ছাপালেন কেন? 'হাড়জ্বালানী' প্রকাশের পর কি গোলাম হোসেনই মুন্সী নামদার নামধারণ করেছিলেন অথবা তাঁরা দুজনে ভিন্ন ব্যক্তি।

'হাড়জ্বালানী' যে গোলাম হোসেনের রচনা সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এটি প্রকাশও হয়েছে মুন্সী নামদারের নামে প্রকাশিত 'কলির বউ হাড়-জ্বালানী' বইএর চার বছর আগে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, মুন্সী নামদারের বইগুলি একাধিক প্রকাশক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেন। সম্ভবত লেখকের নাম ও তাঁর রচনা সে সময় অঞ্চলবিশেষে জনপ্রিয় হয়েছিল। ফলে, প্রকাশক সিদ্ধেশ্বর ঘোষ তাঁর ব্যবসার স্বার্থে বইটি মুন্সী নামদার প্রণীত বলে ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ) প্রকাশ করেন। গোলাম হোসেন ও মুন্সী নামদার এক ব্যক্তি ছিলেন বলেও মনে হয় না। কারণ, ঐ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ একই প্রেস থেকে বছরখানেক আগে (১২৭৪ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ) বইটি গোলাম হোসেন প্রণীত বলেই প্রকাশ করে-ছিলেন। এ বইএ লেখকের ভনিতাও ছিল :

গোলাম হোছেন নাম বসন্তপুরেতে।
রচিত রসের কথা শুন সকলেতে ॥

অনুমান করা যায় যে, পরের বছর সিদ্ধেশ্বর ঘোষ তাঁর ব্যবসার দিকে দৃষ্টি রেখে বইটি জনপ্রিয় মুন্সী নামদারের নাম দিয়ে ছাপিয়েছিলেন এবং ভনিতায় 'গোলাম হোসেন নাম বসন্তপুরেতে' তুলে দিয়ে মুন্সী নামদার নাম ভূপতিপুরেতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। হয়ত ইতিমধ্যে গোলাম হোসেন ইন্‌তেকাল করেছিলেন এবং সিদ্ধেশ্বর ঘোষ কোন উপায়ে, প্রকাশক জমীরদ্দীর কাছ থেকে বইটি ইচ্ছেমত রূপ দিয়ে প্রকাশ করার অনুমতি পেয়েছিলেন। সে জন্যই তিনি বইটিকে 'শ্রী সেখ জমীরদ্দীর অনুমত্যানুসারে' প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই অন্য কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত আমরা ধরে নেবো যে, মুন্সী নামদার নয়

গোলাম হোসেনই 'হাড়জ্বালানী'র প্রকৃত লেখক এবং তাঁরা এক নন ভিন্ন লোক এবং তাঁরা সমসাময়িককালের দু'জন মুসলমান গদ্য লেখক। সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করাই ছিল তাঁদের সাহিত্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মুন্সী নামদার ও তাঁর রচনার পরিচয় দিয়ে, মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল সাহেব 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'র ৮ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৭১ সাল) একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রবন্ধ থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের পাঠক সমাজ মুন্সী নামদারের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। আমি লণ্ডনে পড়াশুনা করার সময় ১৯৬১ সালে, ব্রীটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে নামদারের বইগুলি পড়ার সুযোগ পাই। এখানে আমরা নামদারের বইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করবো।

কালানুক্রমিকভাবে বিচার করলে মুন্সী নামদারের প্রথম রচনা—'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ'। বইটি ১৭৮৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, 'কলিকাতা গরণহাটা ষ্ট্রীটে ৯২নং ভবনে এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে মুদ্রিত' হয়। পুস্তিকার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো। এতে রসিকবাবু ও তাঁর স্ত্রী তারামণির দাম্পত্য কলহ এবং পরস্পরের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ ও রসিকতার একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রসিক বাবু ও তারামণির কথায় কথায় ঝগড়া, তুচ্ছ কারণে পরস্পরের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ :

রসিক বাবু। কোথা গেলে হে। ছেলে কাদতে লাগল দুধ দেও না, মর উত্তর পাওয়া ভার যে।

তারামণি। বলি কেন এত ডাক পড়ছে, ভাঙ্গা ঘরের কাঁথ পড়েছে। ছেলে কাঁদবে তা কি করবো, ছেলে কি কোলে করেই ঘরে বসে থাকবো না কি, কেমন জন্মদোষে ছেলে হয়েছে তা এক দণ্ডও কোলে থেকে ভুঁয়ে নামে না।

রসিক বাবু। ছেলের জন্মের দোষ বই আর কি, তা তুমিই জান মেয়ের ঘরে প্রত্যয় কি ? কি না করতে পারে, মনে কল্লে চাই কি দুপাশে দুজন থাকে।

তারামণি। হেঁ তা বটে পুরুষের মনটাই বড় ভাল, আমরা তবু পুরুষের বোঝা বুকে করে বই, পুরুষতো তা পারেনি, যদ্যাপিও বয় তবে একটা সুন্দর মেয়ে মানুষ দেখলেই অগ্নি ঝুপ করে ফেলে দেয়, এমন যদি আমাদের হতো তবে আর পোঁদে কাছা দিতে হতো না, নারি যদি না জন্মাইত তবে না জানি কি হতো।

এমনি ভাবে একজন পুরুষজাতিকে, অন্যজন নারীজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে: 'ধিক্ ধিক্ নারী জেতে ধিক্ ধিক্ ধিক্। বুঝিলাম নারী লোকে বড় অধার্ম্মিক॥ মেছুয়া বাজারে দেখ কত নারীগণ। বারাণ্ডাতে বসে থাকে পুরুষ কারণ।' তাদের বিবাদ ঘটতে যেমন সময় লাগে না, মীমাংসা হতেও তেমনি দেরী হয় না। লেখক বলেন, 'স্ত্রীপুরুষের ঝকড়ায় না বসে শালিশ্য। আপনি ঝগড়া হয় আপনি যে ভস্ম॥' নারী যতই অভিমানী আর মুখরাই হোক না কেন, পুরুষের জন্য সংসারে সে সুধা বর্ষণ করে, 'রসবতী সতী যদি হেঁসে কথা কয়। তুচ্ছ হয় স্বর্গপুরী প্রিয় সে সময়॥'

রসিক এবং তারামণির দ্বিতীয় ঝগড়ার চিত্রটি আরো কৌতুকপূর্ণ। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসে না, তারামণি স্বামীকে বলে: 'হাঁগা তুমি নাকি অনেক গান টান জান লোকের মুখে শুন্তে পাই, তা কই একটা বলোনা শুনি।' রসিক বলে, 'হেঁ গান গাইবো ওঘরে মা শুয়ে আছেন কি মনে করবেন, বলবেন মাগভাতারে গান গাচ্চে, একেই যে প্রদীপ নিবুতে হয়।' কিন্তু তারামণির জেদ শান্ত হয়নি, শেষে রসিক বাবু একটি ছড়া বলেছে, তার মধ্যে এক সুন্দরী নারীর বর্ণনা শুনে তারামণির সন্দেহ হয়েছে যে, ঐ সুন্দরী তার স্বামীর রক্ষিতা। বেচারা রসিক বাবু তার মন থেকে এ অলীক সন্দেহ দুর করার জন্য গলদঘর্ম হয়েছে। তার অবস্থা দেখে লেখক কলির মেয়েদের 'খুরে দণ্ডবত' করে বিদায় দিয়েছেন: 'কলিকালে মেয়েদের খুরে দণ্ডবত। যেতে কাটে আস্তে কাটে সাঁকের করাত।'

প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যজীবনের সরস চিত্র,, 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ।'

'দুই সতীনের ঝকড়া।' এটি মুন্সী নামদারের দ্বিতীয় বই। বইটির তিনটি মুদ্রণ পাওয়া যায়। প্রথমটি সেখ জমীরদ্দী প্রকাশ করেন ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃঃ)। দ্বিতীয় মুদ্রণটির প্রকাশক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। ইনি প্রকাশ করেন ১২৭৫

সালে (১৮৬৮ খৃঃ)। তৃতীয় মুদ্রণটির প্রকাশ হয় ১২৭৬ সালে (১৮৬৯ খৃঃ), প্রকাশক ছিলেন সেখ জমিরদ্দী। সবগুলি মুদ্রণই হয় কোলকাতায়।

'তুই সতীনের ঝকড়া'র (তৃতীয় মুদ্রণ) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ষোল। একাধিক স্ত্রী থাকলে পুরুষের জীবনে যে নিদারুণ বিড়ম্বনা ও মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে, তারই করুণ ও বাস্তব চিত্র এ পুস্তিকায় অঙ্কিত হয়েছে। 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দন্ত' বইএ দাম্পত্যজীবনের যে মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে তার বিপরীত ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এ-বইএ কোন চরিত্রের নামকরণ করা হয় নি। বড় বৌ, ছোট বৌ, ননদী, দিদি বুড়ী ও বাবু এই পাঁচটি চরিত্র নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

এক লোকের ঘরে তুই স্ত্রী। সে থাকে বিদেশে। তার অবর্তমানে বউদের ননদী এসেছে ভাইএর খবর নিতে। তার আশঙ্কা, এক বউএর সঙ্গে কথা বললে অন্য বউ বেজার হয়ঃ

"ননদী। বলি ওলো ছোট বউ, তুই যে বড় চুপ করে রয়েছিস, ক্যান তোর সতীনের সঙ্গে কথা কচ্চি বলে মনে মনে বেজার হয়েছিস নাকি ?

ছোট বউ। আমি ক্যান বেজার হব বোন, বেজার হয়ে কি ঘরের ভাত জেয়াদা করে খাব, হচ্চে ঐ দিকেই হোক না কেন।"

স্বামীর অবর্তমানেই তু'সতীন কথায় কথায় ঝগড়া করে। ননদীর সাক্ষাতেও তারা ঝগড়া শুরু করেছেঃ 'ছোট বউ। কি বল্লি লা সর্ব্বনাশী, ভাতার কি তোর একলার, তোর লজ্জা নাই লা, ঐ কে বলে 'ছিরে ছিরকুটি। আর ছেঁড়া কাপড়ে তু ছুটি"। অবস্থা দেখে ননদী সরে পড়েছে। কিন্তু বেচারা স্বামী এত সহজে নিস্তার পায় নি। বিদেশ থেকে সে বাড়ী এসেছে। দীর্ঘ পথ হেঁটে সে পরিশ্রান্ত কিন্তু ঘরে উঠতে পারছে না। কারণ, 'তুই ঘরে তুই দ্বারে তুই রসবতী' এবং 'তুজনায় ডাকিতেছে হাতছানি দিয়া'। ভয়ে সে কাউরি ঘরেই যেতে পারছে না। তার অবস্থা দেখে, 'নামদার বলে ওহে একি সমাচার। না জানি সন্ধ্যার পরে কি হবে তোমার ॥'সন্ধ্যার পরে তার বিপদ ভালভাবেই দেখা দিয়েছে। রাত্রে তুই স্ত্রী তাকে নিজের নিজের ঘরে নেওয়ার জন্য, 'তুইদিকে তুইজন করে টানাটানি। ভাগাড়েতে গরু যেন টানিছে শকুনি ॥' বাড়ীতে ছিলেন 'দিদিবুড়ী' তিনি একটা

মীমাংসা করে দিয়েছেন। কর্তা বিদেশ থেকে ২৫৲ টাকা সঙ্গে এনেছিল সেটা দুই সতীনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, তিনি দুই স্ত্রীকে নিয়ে একই ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তাতে বাবুর অশান্তি বেড়েই গেছে, তাকে 'দুইজনে টানাটানি এপাশে ওপাশে।' ফলে 'সমস্ত রজনী বাবু পড়িল অবশে।' তার এ দুর্গতি দেখে মুন্সী নামদার বলেন, 'তাই হাত যুড়ে আমি সবে করি মানা। এ সংসারে দুসংসার করোনা করোনা।'

শেষ পর্যন্ত কর্তা বাড়ী থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে পীড়িত হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। তার হাতে 'টাকা কড়ি' নাই। ফলে, কেউ তাকে গ্রহণ করে নি :

"বড় সতীন। যানা যানা তোর ছোট বউয়ের কাছে যানা, আমি কোথা পাবো যে খাওয়াবো।

ছোট সতীন। হ্যাঁ, আমি বুঝি কাটনা কাটা ধন রেখেছি তোকে বসে ২ খাওয়াবার জন্যে, যে তোর বেশী রোজগার খেতো তার কাছে যানা।"

শেষে কর্তা, 'অযতনে একদিন গেলেন মরিয়া।' গল্পের শেষ এখানেই। লেখক পাঠককে উপদেশ দিয়েছেন, 'কেহ না এমন কর্ম কর কদাচন'। তাঁর মতে একাধিক স্ত্রী থাকলে, আন্তরিক ভালবাসা জন্মে না। ফলে, 'অসময়ে কেহ কার না হয় দোসর।'

প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের ট্রাজেডী, 'দুই সতীনের ঝকড়া।'

মুন্সী নামদারের তৃতীয় বই 'ননদভাজের ঝকড়া' এবং চতুর্থ বই 'বাঞ্ছারামের গল্প।' বই দুটি একত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃঃ)। প্রকাশক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। ১২৭৬ সালে (১৮৬৯ খৃঃ) সেখ জমিরদ্দীও বই দুটি একত্রে কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। দুটি বইএর একত্রে পৃষ্ঠা সংখ্যা ষোল।

'ননদভাজের ঝকড়া' উপদেশমূলক রচনা। স্বামীর আদেশ লংঘন করলে, তাকে কটুবাক্য বললে, পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দিলে, মৃত্যুর পরে নারী অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। কাজেই তাদের ঐসব কাজ পরিহার করে সুগৃহিণী হওয়া উচিত। এই হচ্ছে বইএর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পুস্তিকায় দুটি মাত্র চরিত্র, 'ননদ' এবং 'ভাজ'। ভাজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে, কে যেন তার হাত পা কেটে ফেলেছে, দু'কানে শিশা ঢেলে দিয়েছে, জিবে শূল বসিয়েছে এবং তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। ননদের কাছে সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে, সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে উপাসনায় দিন কাটানোর সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছে। ননদ তাকে স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে। স্বামীর বিনানুমতিতে যে নারী কোথাও যায় পরকালে তার পা কাটা হয়। স্বামীর অগোচরে অর্থ ব্যয় করলে তার হাত কাটা হয়। স্বামীকে কটু বাক্য বললে তার জিবে শূল বসানো হয় ইত্যাদি। কাজেই ননদী তাকে সংসারে থেকে মন্দকাজ পরিহার করে চলতে উপদেশ দিয়েছে। তার মতে সংসারধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সে বলে, 'এই যে সংসারখানা দেখিতে পাও এ কম নয়, এই স্থানেই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই স্থানেই পাপ পুণ্য।'

'বাঞ্ছারামের গল্প' পুস্তিকাটিও উপদেশমূলক রচনা। বাঞ্ছারাম নামে 'গুণের সাগর' 'সকল বিদ্যায় পরিপূর্ণ' এক লোক ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র দুঃখীরাম 'চুরি ও লোচ্চামি আর করে মদ্যপান'। ছেলেকে সৎপথে আনার জন্য পিতা 'গুরু ঠাকুর'কে ডেকে আনলেন। তিনি দুঃখীরামকে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু সে সাফ জবাব দিল, 'ঠাকুর মহাশয়, আমি সকল কর্ম পরিত্যাগ করিব এই তিন কর্ম্ম ছাড়িতে পারিব না।' গুরু তখন তাকে বললেন, 'মদ খাও কিন্তু বাপু দোকানে খেও না। চুরি কর্ম্ম কর কিন্তু সত্য বলিও না। লোচ্চামি করিতে কভু প্রভাতে না যাবে।' পরদিন দুঃখীরাম গুরু যা নিষেধ করেছেন তাই করতে চললো। মদের দোকানে গিয়ে সে দেখে মাতালরা 'হেগে মুতে পড়ে আছে অচৈতন্য হৈয়া। কেবা কার গায়ে দেয় নেকার করিয়া'। সকালে বেশ্যাবাড়ী গিয়ে দেখে, 'বেশ্যালোক সমস্ত রাত্রের সংঘটনে অত্যন্ত কুৎসিত এবং ছিন্নভিন্ন বেশ, এলোকেশ, নেকার করিয়া বাসি বিছানায় পড়ে আছে।' এসব দেখে ঘৃণায় সে মদ এবং বেশ্যা সংস্পর্শ ত্যাগ করলো। এরপর সে চললো চুরি করিতে। পথে চৌকিদারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে তাকে বললো যে চুরি করতে যাচ্ছে। শুনে চৌকিদার তাকে মারপিট করায় সে চুরি করা ছেড়ে দিল। গল্পের শেষ এখানেই।

উনিশ শতকের নগরকেন্দ্রিক সমাজের একটি সমস্যা ছিল তরুণরা, 'লোচ্চামী আর করে মদ্যপান।' মুন্সী নামদার সে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন 'বাঞ্ছা-রামের গল্প' পুস্তিকায়।

'নূতন ঝড়' নামদারের পঞ্চম পুস্তিকা। এটি সিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃঃ) কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি মূলত পদ্যে লেখা, গদ্যের নিদর্শন সামান্যই আছে। গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে সমসাময়িক কালের ঘূর্ণিঝড় ও আকালের চিত্র এতে অঙ্কিত করা হয়েছে। লেখক বলেন,

একাত্তরে ঝড় করিলে তিয়াত্তরে আকাশ দিলে
চুয়াত্তরে ফের মারিলে হয়েছিলাম মরো মরো।

তিনি মনে করেন দেশে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হয়েছে এবং লোকে নানা রকম অন্যায় ও পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তারই ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বারে বারে দেখা দিচ্ছে।

বইটিতে দুর্ভিক্ষের বর্ণনাটুকু মূল্যবান। এ ছাড়া এর কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

লেখকের ষষ্ঠ বই 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা'। বইটির দুটি মুদ্রণ পাওয়া যায়। প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃঃ), প্রকাশক ছিলেন সেখ জমিরদ্দী[১]। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রকাশক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। এটি প্রকাশ হয় ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ)। প্রথম মুদ্রণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ষোল। সমসাময়িক কালের সমাজের একটি কুৎসিত দিককে রূপকের মাধ্যমে অঙ্কিত করা হয়েছে। এতে শিল্পীর সমাজ সচেতনতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্পিত রূম দেশের 'অরণ্য কাননে' শিয়াল হয়েছে রাজা। সে ভাবলো, 'মণ্ডল বিহনে গ্রামে হয় গণ্ডগোল।' কাজেই ছুঁচা, পেঁচা ও বানরকে সে মণ্ডল নিযুক্ত করলো। তারা সভা করছে এমন সময় সেখানে এক ঠক খেকশেয়াল এসে হাজির ঃ

"মড়ল। কে হে বাবু তুমি।

খেকশেয়ালী। আজ্ঞে মহাশয় আমি এই গ্রামের ঠক অদ্য শুনা হলো মহাশয়েরা মড়লী ভারার্পণ পেয়েছেন তাইতে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছি।

মড়ল। হ্যাঁ বাবু আমাদের তো মন ছিল না তা রাজা মহাশয় বল্লে যে তোমাদের মতন ভদ্র তো আর কেহ নাই কাকে মড়লী দিব।

---

১। বইটির শুরুতে প্রকাশকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রচনা শেষ হওয়ার পাঁচদিন পরেই বইটি ছাপানো হয়। প্রকাশক বলেন, 'সমাপ্ত করিয়া পুস্তক মম হস্তে দিল। পাঁচ দিবস পরে গল্প প্রকাশ হইল ॥'

খে—ঠক। আহা সে কি কথা মহাশয় আপনারা তিন জনার মধ্যে কেহ তো কম নয়, মহাশয়েরা যদি আমার পক্ষে থাকেন তবে ভাবনা কি গো কত বেটাকে হাগ্‌য়ে ছেড়ে দি।

খেঁকশেয়াল চললো পাড়ায় তাদের মোড়ল নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রচার করতে। প্রথমেই তার সঙ্গে বাঘের দেখা। বাঘকে সে 'পেঁচা ছুঁচা বাঁদরে'র বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। পাড়া থেকে ফিরে মোড়লদের উত্তেজিত করেছে বাঘের বিরুদ্ধে। মোড়লরা তার কাছে পরামর্শ চাইলে সে বলে: 'মহাশয়েরা এইখানে কাছারি করে বসেন আমি সে বেটাকে বেন্ধে আনি গে।' কার্যতঃ খেকশেয়াল দুপক্ষকেই উত্তেজিত করেছে এবং তার প্ররোচনায় বাঘ এসেছে মোড়লদের আক্রমণ করতে। তখন, 'খেকশেয়ালী তাহাদিগকে কহে ইশারায়। প্রজাকে দেখিয়া কেন ভয় মহাশয়।। তোমাদের মড়লী বাঘ শুনেছে কানেতে। এজন্য এসেছে বেটা কসুর মানিতে।। বাঘেরে কহিল ফের শীঘ্র করে যাও। এই বেলা বেটা দিগে ধরে ধরে খাও।।' বাঘের ভয়ে ছুঁচো লুকিয়েছে গর্তে, পেঁচা মেলেছে ডানা। কিন্তু বানর ধরা পড়ে নাকাল হয়েছে। পরে বাঘ বেড়ালের সাহায্যে ছুঁচোকে এবং কাকের সাহায্যে পেঁচাকে জব্দ করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে এবং মহাসুখে বনে রাজত্ব করেছে।

'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' পুস্তকে মুন্সী নামদার শঠপ্রকৃতির মানুষকে চিত্রিত করেছেন। মনে হয় সে মানুষ তাঁর চারপাশেই বিদ্যমান ছিল। বইএর শুরুতে প্রকাশকের বিবরণেও সে কথাই সমর্থিত হয়। সেখ জমিরদ্দী বলেন: 'আমের গ্রামেতে বড় শিয়াল মহাশয়। বড়ই দুষ্ট জোয়ে পেলে কুকড়া ধরে খায়।' ঝোঁপ বুঝে কোপ মারার মানুষ আজকের মত সেদিনও সমাজে যথেষ্টই ছিল।

উনিশ শতাকর পরিবর্তনশীল সমাজের সুবিধাবাদী মানুষের চিত্র, 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা'।

মুন্সী নামদারের সপ্তম বই 'নারীর ষোল কলা' এবং অষ্টম বই 'খেলারামের গীত' একত্রে প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ)। বই দুটির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। প্রথমটিতে এক নারী কি করে তার স্বামীকে নানা কৌশল করে বিদেশ যাওয়া থেকে নিরস্ত করেছে তার বিবরণ আছে। তার কৌশলগুলি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কুসংস্কারকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। যেমন,

যাত্রার মুহূর্তে পেছন থেকে হাঁচি, পানি ভর্তি কলসী নিয়ে পড়ে যাওয়া, অশুভ স্বপ্ন, নাপিত ও ধোপানীর আবির্ভাব ইত্যাদি।

'খেলারামের গীত' আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। এতে গদ্যের কোন নিদর্শন নাই।

লেখকের নবম গ্রন্থ 'মনোহর ফেঁসঁড়া' উপরোক্ত দু'টি বইএর মতই বৈশিষ্ট্যহীন। এটি কোলকাতা থেকে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্তৃক ১২৭৫ সালে ( ১৮৬৮ খৃঃ ) প্রকাশিত হয়।

এতে রূপকথা জাতীয় একটি প্রণয়কাহিনী গদ্যে পদ্যে বর্ণিত হয়েছে। সত্য-পীরের সেবা করার জন্য অযোধ্যানগরের শঙ্কর দত্ত নামে এক সাধুপুত্র ফেসঁড়া নামে এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে সে মনোহর নামে এক প্রবঞ্চকের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু মনোহরের সুন্দরী কন্যা রত্নেশ্বরী শঙ্করের প্রেমে পড়ায় সে শেষ পর্যন্ত তার সহায়তায় রক্ষা পায়। রত্নেশ্বরী এবং শঙ্করের মিলন এবং মনোহর ও তার ছয় পুত্রের সঙ্গে আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়।

'খেদের গান' মুন্সী নামদারের দশম গ্রন্থ। সেখ জমিরদ্দীর আদেশানুসারে এটি সিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা ১২৭৫ সালে ( ১৮৬৮ খৃঃ ) কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা পনেরো।

দেশে আকাল দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে দেশের মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছিল। তারা নিজেদের শেষ সম্বলটিও বেচে খেয়েছিল, 'পাঁচ সিকিতে দামড়া গরু বেচে খেনু ভাই। গামচাতে টাকার চাল্য বান্ধ্যে আঁটে নাই।' বাধ্য হয়ে, 'সজনাসাক কলমিলতা সিদ্ধ' করে খেয়েছিল। তারা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে গ্রাম ছেড়ে কোলকাতা শহরে এসেছিল। কিন্তু পরের বছর ক্ষেতে ফসল ভাল হওয়ায় আকাল গিয়ে সুকাল এসেছে। শহর ছেড়ে মানুষ আবার গ্রামে ফিরে গেছে। 'খেদের গানে' লেখক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের আক্ষেপ এবং দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের আনন্দের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেসব ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে চাউলের কেনা বেচায় মুনাফা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, 'খেদের গানে' তাদেরও খেদ ব্যক্ত হয়েছে। চালের নৌকার মাঝিদের কথোপকথনটি কৌতুকপ্রদ, এতে পূর্ব বাংলার কথ্যভাষার ব্যবহার আছে।

"মাজি। ওরে বাই টোনাগাজি চাউল তো বিক্কনারে বাই।
ডাঁড়ি। ওরে বাই খি খৈছেন হাপ্পে খোদা নি মারছে, টোনাগাজি চাউল আনছিল দেশে হৈতে হাড়ে পাঁচ টাহা আজনি বেচে ছুই টাহা।
মাজি। আহা বাইরে বাই আর কওনার বাই আমারে মারছে।"

দেশের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের প্রয়াসেই এ-বই রচনা করা হয়েছে। সম্ভবত মুন্সী নামদার তাঁর নিজের অঞ্চল বালিয়া পরগণার আকাল ও সুকালের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন "খেদের গান' পুস্তকে।

আমরা এ পর্যন্ত যেসব উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছি তাকে সম্বল করে বলতে হলে বলতে হয়, 'কলির বউ ঘরভাঙ্গানী' মুন্সী নামদারের শেষ রচনা। পুস্তকটি ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ) কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ১২৭৬ সালে। এটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ষোল।

কলিকালের দুর্নীতি দেখে মুন্সী নামদার আক্ষেপ করছেন। এ কালে, 'হাড়িতে উড়ায় শাল মেতরে আতোর। দিনেতে মোল্লাজী হন রাত্রে নেসাখোর।।' সমাজে ছোটরা রাতারাতি বড় হয়েছে ফলে, 'ভদ্রের ভদ্রস্থ গেল ছুঁছো হৈল বাবু।'

সংসারে কলিকালের একটি প্রধান বিড়ম্বনা হয়েছে, পুত্রেরা বউএর অত্যন্ত অনুগত হয়ে পড়েছে। পুত্রবধূদের প্ররোচনার ফলে বৃদ্ধ পিতামাতা সংসারে পুত্রের সহায়তা হারিয়ে ফেলেছে। 'কলির বউ ঘরভাঙ্গানী'তে লেখক তারই করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

একালে, 'সকল বাবু ভেয়েরা ফুল বাবু হয়ে বেড়ান, কিন্তু স্ত্রীলোকের অনুমতি ভিন্ন চলেন না, পিতামাতার সেবা কিছুই করেন না, অত্যন্ত রমণীবশ হয়ে থাকেন, সে কেমন, দেখ যতদিন পুত্রসন্তানাদি না হয় ততদিন পরমেশ্বরের নিকটে কত সেবা সাধনা করিতে ২ যদি একটি পুত্র সন্তান হয় তবে কত দুঃখভোগ করিয়া লালন পালন করে এবং লেখা পড়া শিখায়। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ সিয়ানা হইলে পরকেটে উড়েন, আর পায় কে? বিবাহ না দিলেই নয়, বাবু লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারেন না, কিন্তু মনে ২ মহারাগ। একবার এদিক পালায়ে যান, একবার ওদিক পালায়ে যান, ঘরের কর্ম্ম কার্য কিছুই করেন না, মনে ২ করেন যে এ বুড় বুড়ীর মৃত্যু হইলেই

বাঁচি।' মা জননী ছেলের মনোভাব বুঝতে পেরে, 'বেটার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে শুনিতে ভাল এবং রূপে গুণেও উত্তম সুধীর স্থির করিয়া বিবাহ দিলেন।' কিছুদিনের মধ্যে বউটি 'যুবতী হইয়া বাবুকে ক্রমে ২ কাবু করিতে লাগিলেন। ··· যুবতী যদি বলেন হেদেও মিনসে, একখানা ঢাকাই শাড়ী কিনে এনে দেতো, বাবু বলেন যে আজ্ঞা আনিতেছি।' শেষে এমন হোল যে, সে 'ওঠ বল্লে ওঠেন বস বল্লে বসেন।' স্বামীকে সম্পূর্ণ বশ করার পর যুবতীভিন্ন হওয়া যুক্তি' করলো। প্রথম রাত্রিতে সে কপট কান্না কেঁদে স্বামীর কাছে অভিযোগ করলো, 'তোমার মা আমাকে প্যাজি খেতে দেয় নাই, এবং গালাগালি কেবল দেয় মারিতেই বাকি, বলে ভাইখাগি বেরো।' সকালে এ নিয়ে ছেলেটি মায়ের সঙ্গে বচসা করে এবং 'ক্রোধভরে অনাহারে আপন কর্ম্মে গমন' করে। দ্বিতীয় রাত্রে বউটি স্বামীর কাছে অভিযোগ করে যে, রাত্রে তার শাশুড়ী তাদের কথা 'কানাচে এসে শুনিয়াছে' এবং সকালে তাকে লাঞ্ছনা দিয়েছে। স্বামীকে পরামর্শ দিয়ে সে বলে, 'তুমি ত আমার কথার নও আমিত পূর্ব্বেই বলেছিনু যে আমার পিতার আলয় গিয়ে থাকি সেই স্থানে তোমার কত আহ্লাদ আমোদ হইত।' কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি হাতছাড়া হবে এই ভয়ে, ছেলেটি শ্বশুর বাড়ীতে বাস করতে রাজি হয় নি। তৃতীয় রাত্রে বউটি স্বামীকে ভিন্ন হওয়ার পরামর্শ দিল। সকালে সে অকারণে শাশুড়ীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিল, নিজের হাতে নিজের মাথায় আঘাত করে রক্তপাত করলো। 'পাড়ার গিন্নী সকলে' এসে তাদের সংসার ভিন্ন করে দিলেন। এর পর লেখক 'বাবুর বাজার করা'র চিত্র এঁকেছেন : 'এইরূপে উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন হইল পরে যখন বাবু বাজার যান তখন ভাল ভাল রোহিত মৎস্য এবং কত দ্রব্যাদি লন, বুড়বুড়ীর জন্য যদি মনে পড়ে তবে এক পয়সার চুনো মৎস্য এবং নটে শাক আনিয়া দেন। ··· স্ত্রীর মস্তকে দিবার জন্যে তৈল আনেন, চামেলি বেলার চুয়া চন্দন মজুমার সুগন্ধি। মাকে হোথা সরিষার তৈলও মিলে না।' কিন্তু এ অবস্থাও বেশীদিন চলেনি, 'কিঞ্চিৎকাল পরে এমনি হইল, বাপ বলে বেটা কেটা, বেটা বলে কে ওটা।' পুস্তকের কাহিনী এ ভাবেই শেষ হয়েছে।

'কলির বউ ঘরভাঙ্গানী'তে পদ্যের ব্যবহার সামান্যই, প্রায় সমস্ত বইটি গদ্যে লেখা। একই সমস্যা নিয়ে গোলাম হোসেন লিখেছেন 'হাড়জ্বালানী'। মনে হয় সমাজের কোন বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করেই তাঁরা এ ধরণের নক্সা এঁকেছেন।

বই দুটিতেই কোন চরিত্রের নামকরণ করা হয় নি। হয়ত কাছের মানুষের কাহিনীই তাঁদের পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে।

গোলাম হোসেন রচিত "হাড়জ্বালানী" (সাইজ ৮"×৫") ষোল পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। এটি ১২৭১ সালে (১৮৬৪ খৃঃ) কলিকাতা গরণহাটা ষ্ট্রীটের ৯২নং ভবনে এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। বইয়ের শেষে এর প্রকাশকের নাম, ঠিকানা ও দাম দেয়া হয়েছে ঃ "শ্রী সেখ জমিরদ্দী সাং বন্দিপুর, জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মূল্য /. এক আনা মাত্র।"

পুস্তকে কোন চরিত্রেরই নামকরণ করা হয়নি। মা, ছেলে, বউ এবং তাদের কয়েকটি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে একটি ছোট্ট পরিবার। ছেলে বাড়ী থেকে দুরে কোন এক জায়গায় কাজ করে এবং সেখানেই থাকে। এদিকে বাড়ীতে বউ শাশুড়ীতে সংসরের কর্তৃত্ব নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। বুড়ী শাশুড়ী হয়েছে বউ-এর চক্ষুশূল, তাকে সংসার থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত তার আর শান্তি নেই। শাশুড়ীর ভাল মন্দ কোন কথাই বউএর সহ্য হয় না। একদিন কথায় কথায় তাদের ঝগড়া বেধে যায়ঃ

"শাশুড়ী। ওগো বউ তুই যে আজ বড় চুপ করে বসে রয়েছিস্ কাজ কর্ম্ম কি কিছু নাই।

বউ। যাগ্যে বাবু পোড়ার ঘর কন্না থাকলেই কি না থাকলেই কি ?

শাশুড়ী। কেন গো বউ তোর যে আজ কথাগুলে উল্টো ২ লাগচে, রোজ সকাল বাসি কর্ম্ম কাজ সারিস আজকে একবারে সব ছেড়ে দে বসেছিস্।

বউ। (শাশুড়ীর প্রতি) যারে বাবু তোর আজ গিন্নিপনা মোর গায়ে সহে না। তুই যত ভালবাসিস তা জানা আছে।

শাশুড়া। ওমা তুই কি বলিস গো আমি তোকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, আমার বৃদ্ধকাল কোন দিন মরি কোন দিন বাঁচি, তোর ঘর কন্না তুই বুঝে করবি। আমি যতদিন বেঁচেছি আর কি ততদিন বাঁচবো গো।

বউ। হেঁ তোমাদেব এখন মরণ আছে তা মরবে।

শাশুড়ী। হেঁগা বউ তুই আজ আমাকে এখন কথাটা কেমন করে বল্লিগা।"

বউটি সুযোগের সন্ধানেই ছিল। ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে সে শাশুড়ীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিতাড়িত হয়ে বুড়ী প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং ছেলেকে

চিঠি লেখে কবিতায় :

পয়ার। আশীর্ব্বাদ করি বাবা পুত্রটি আমার।
মাটি যেন সোনা হয় করেতে তোমার।।
সুখে খাও সুখে পরো সুখে সর্ব্বক্ষণ।
সুখের সমুদ্রে যেন রাখে নিরঞ্জন॥
বিবরিয়া কহি বাবা আমার কাহিনী।
বৃদ্ধকালে দুঃখ পাই তোমার জননী॥
অন্নত্যাগী করেছে বউটি আমার।
তুমি ঘরে এলে পরে হইবে বিচার।

এ ঘটনার পর বউএর মা এসেছে জামাইবাড়ী। মেয়ের কাজ সে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে :

"মাতা। কোথা গো মা, জামাই বাড়ীতে এসেছিল গা।

ঝি। না গো মা আসেন নাই, এখন নাকি আসবেন না শুনছি।

মাতা। তোর শাশুড়ী কোথা গো দেখিনি যে কোথায় গেছে বুঝি।

ঝি। না গো মা কাল সে বুড়ো বেটিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

মাত্য। বেশ করেছ ২ আপদ গেছে। হাড়ে বাতাস লেগেছে।

ঝি। হেঁ মা বত্তেছি, মাগি সারাদিন বসে খিট ২ কত্তিইছে।

মাতা। তা বটে মা যথার্থ বটে, সমস্তদিন বসে থাকে আর খেতে কেমন বাপরে বাপ বেড়াল ডিঙ্গিতে পারে না।"

মেয়ের মা বুদ্ধিমতী। সে জানে 'আপদ গেছে' বটে তবে তাকে চিরকালের জন্য দূর করতে হলে জামাইয়ের অনুমোদন দরকার। কাজেই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সে জামাইকে চিঠি লিখেছে :

পয়ার। সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি প্রাণপণে।
শাশুড়ির পত্র শুন প্রসন্ন বদনে॥
অধিক কি কব বাবা তব ছেলে পুলে।
আমি এসেছিনু যেই তেঁই রক্ষা পেলে॥
আমার মেয়ের সঙ্গে ঝকড়া করিয়ে।
রয়েছে তোমার মাতা অন্য বাড়ী গিয়ে॥
ত্বরায় আসিয়ে বাড়ী করিবে বিহিত।
শাসন করিবে তাকে যে হয় উচিত॥
তোমার পুত্রকে আর তোমার কন্যাকে।
কত শত গালি দেয় দেখে চক্ষে চকে॥ ···

বিদেশে ছেলেটি মা ও শাশুড়ীর চিঠি এক সময়েই পেয়েছে। মায়ের চেয়ে শাশুড়ীর কথাতেই তার বিশ্বাস বেশী। 'অতি শীঘ্র' বাড়ী এসে সে স্ত্রীর কাজ সমর্থন করেছে ; কিন্তু তার মান ভাঙ্গানো সহজ হয়নি :

কর্ত্তা। কোথা গেলে এ সব সামগ্রি এনেছি তোলনা এখন তুমিই তো গিন্নি আর কে।

গিন্নী। (মান্ ভরে) কারো ঘর করব নি, কারো কেঁথা পুড়লে বলবোও নি॥

ছেলের বাড়ী আসার খবর পেয়ে বুড়ী মা এসেছে আশায় বুক বেঁধে। এবার তার উপর অন্যায়ের প্রতিকার হবে। কিন্তু তার ছেলে স্ত্রী ও শাশুড়ীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং মাকে চিরতরে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেছে। দুখিনী মা দুঃখের গান গেয়ে বেড়িয়েছে পথে পথে। এই দৃশ্য দেখে লেখক আক্ষেপ করেছেন :

গীত। তাই বলি কলিতে কর্ত্তা হল শ্বশুর শাশুড়ী।
কত লোক পিতা মাতা ছেড়ে থাকে সেই বাড়ী।
শাশুড়ী বলিবে যাহা
কে খণ্ডিতে পারে তাহা
কলিকালে শাশুড়ী সব খেতে বলে ভিন্ন হাড়ী।

ছেলের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে বুড়ী মা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে। প্রতিবেশিনীরা ধিক্কার দেয় কিন্তু তাতে ছেলে বউ কান দেয় না। একদিন বুড়ী তাদের গ্রামে ভিক্ষা করতে এসেছে শুনে বউটি তার ছেলে মেয়েদের বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিতে বলেছে। পাছে বুড়ী ছেলের বাড়ীতেই ঢুকে পড়ে ! 'হাড়জ্বালানী'র কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে। সবশেষে লেখক পয়ার ছন্দে পাঠককে উপদেশ দিয়ে তাঁর পুস্তকের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন :

সেবা করিবে যেই পিতা ও মাতায়।
সুখেতে বৈকুণ্ঠ যাবে কহিনু সবায়॥
সমাপ্ত হইল এই রসের কাহিনী।
তাই বলি কলির বউ বড় হাড়জ্বালানী॥

হয়ত কোন বিধবা নারী একমাত্র পুত্রের জন্য একটি টুকটুকে মেয়ে ঘরে এনে সোনার সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু 'কলির বউ' আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল

তাড়নায় তাকে বৃদ্ধ জীবনের শেষ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে যে-মর্মান্তিক বেদনা সৃষ্টি করেছিল, গোলাম হোসেন 'হাড়জ্বালানী'তে তারই একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। সম্ভবত কোন বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই নক্সা জাতীয় রচনাটি লিখিত হয়েছে। এতে কোন চরিত্রের নামকরণ না করার মূলেও ঐ কারণটি বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়। লেখক তাঁর কাছের মানুষকেই বইটিতে চিত্রিত করেছেন। এর ভাষাও সে জন্য কথ্য—সহজ এবং অনাড়ম্বর।

সমসাময়িক কালের সামাজিক গ্লানিকে প্রহসন জাতীয় রচনার মধ্যে উদঘাটিত করার যে চেতনা আধুনিক কালের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, মুসলমান লেখকদের মধ্যে তার একটি অভিব্যক্তি দেখা যায় 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' পুস্তিকায়। এটি সেখ আজিমদ্দী রচিত (ফুলস্কেপ ৳ সাইজ) ষোল পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র প্রহসন। বইটি 'সন ১২৭৫ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ' ইংরেজী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা গরণহাটা ষ্ট্রীটে ২৬৮নং ভবনে শ্রীকাশীনাথ শীলের জ্ঞানদ্বীপক যন্ত্রে শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত' হয়। বই-এ প্রথম মুদ্রণের কোন তারিখ নির্দেশ করা হয়নি। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে 'বটতলা (অর্থাৎ সস্তা) ছাপাখানা হইতে অজস্র ইতর ধরণের ছোট ছোট পুস্তিকা মুদ্রিত' হওয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে 'শেখ আজিমুদ্দানের' 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে (১৮৬৮)' বইটির উল্লেখ আছে। গ্রন্থকারের নামের বানানে সামান্য অশুদ্ধি থাকলেও আলোচ্য বইটির কথাই যে তিনি বলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'র যে-পরিচয় আমরা দেব তাতে দেখা যাবে, বইটি 'ছোট পুস্তিকা' হয়ত বা 'বটতলা ছাপাখানা' থেকেই ছাপানো, তবে 'ইতর ধরণের' রচনা নয়। বরং সমকালীন প্রহসনগুলোর মধ্যে যে স্থূলতা খুবই সুলভ তা এ-পুস্তিকায় নেই। এতে মুদ্রণের বিবরণ দিতে গিয়ে এটিকে ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত বলা হয়েছে। প্রথম মুদ্রণের কালটি উল্লিখিত থাকলে বা সেটি সংগ্রহ করতে পারলে, বোঝা সম্ভব হোত এটি মুসলমান লেখকের লেখা প্রথম গদ্য রচনা কিনা। মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন 'এর উপায় কি' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তার অনেক। আগেই সেখ আজিমদ্দীর পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বইটি গদ্য সাহিত্যের নির্মাণ যুগের সৃষ্টি এবং গ্রন্থকার এ কালের প্রথম মুসলমান লেখকদের অন্যতম। এটি সে সময়ের অতি দুর্লভ রচনার একটি নিদর্শন।

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' গদ্য পদ্যে রচিত। পদ্যের অংশ কম, গদ্যের অংশ বেশী। অবশ্য এ সময়ের অনেক নক্সা-প্রহসনেই গান, কবিতা এবং পয়ার ছন্দের সংলাপ পাওয়া যায়। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম প্রহসন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে' (১৮৫৪ খৃঃ) কবিতার ব্যবহার কম নেই।

সমকালীন ধারা অনুসরণ করেই 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' শুরু হয়েছে গান দিয়েঃ

গীত। তাল আড়া তেতালা।

হায় কড়িকে কি পদার্থ বিধি করেছেন সংসারে।
কড়ি যার না থাকে করে
কেহ না জিজ্ঞাসে তারে,
কুলের মাথায় লাথি মারে,
কড়ির মাথায় ছাতি ধরে,
কড়ি নৈলে পিরীত ছারে,
কড়ি হৈলে সে প্রেম বাড়ে
যদি প্রেমে ধরা পড়ে,
কড়ি পাইলে ছাড়ে তারে।

কড়ি অর্থাৎ টাকার সর্বগ্রাসী প্রভাব লক্ষ্য করে লেখকের মনে আধ্যাত্মিক ভাবনার উদ্রেক হয়েছে। তিনি গানে সে-ভাবনাকে প্রকাশ করেছেনঃ

গীত। তাল মধ্যমান ঠেকা।

ওরে ভোলা মন আমার
কর নিরঞ্জন সার
সংসারে দেখ যত
সময়েরি অনুগত,
অসময়ে করে হত,
বল কেবা হয় কার।
দারাসুত বন্ধু জন
কিম্বা সহবাসীগণ
সবে চেষ্টা করে ধন
শেষে কেবা কার॥

টাকার বলে মানুষ সংসারে যে-সব অঘটন ঘটাচ্ছে তারই একটি নিদর্শন পুস্তিকাটিতে বর্ণিত হয়েছেঃ

'এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট অধিক ধন ও স্বর্ণ মুদ্রা রজতকাঞ্চন এবং মুক্ত প্রবালাদিতে গুঞ্জিতা অলঙ্কারাদি অধিক, লৌহ সিন্দুকে পুর্ণিত ও বনাত, শাল, ভূমি ইত্যাদি উত্তম ২ অট্টালিকা দোতালা তেতলা থাকায় পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ আয়ু দ্বারা তাহার জীবদ্দশায় স্বপরিবারের লোকান্তর হওয়াতে বৃদ্ধ কত্তা একা ভৃত্যগণের সেবা দ্বারা কালযাপন করিবায় উক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির বণিতার কাল হওয়া পর্যন্ত অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে দিন পার করেন এবং গোমস্তা ও সরকারগণের দ্বারা জমিদারীর কর আদায় নির্ব্বাহ হয়, বৃদ্ধ ব্যক্তি অতি মনঃদুখে সর্ব্বদা বিরসভাবে থাকিয়া স্বীয় মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ সকল ঐশ্বর্য বিষয়াদিতে আমার কি ফল দর্শিল, যদিসাৎ মহাপ্রাণী আমার সর্ব্বদা মহাখেদ সাগরেতেই মগ্ন হইয়া রহিল তবে ধন ও জীবন তাবতই নিষ্ফল, অতএব যাহাতে আমার মহাপ্রাণী পরমানন্দে থাকে তাহাই করা উচিত, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইয়াছে।'

বৃদ্ধ মনের ক্ষেদ ব্যক্ত করেছে পয়ার ছন্দে। সে জানে ঃ

রমণী পরম সুখ যাবৎজীবন।
তদভিন্ন যত সুখ সব অকারণ ॥

তার আক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়েছে বেহাইয়ের আবির্ভাবে ঃ

বেহাই। বেহাই কেমন আছ, মুখটা বড় ভারি ভারি দেখছি কেন?
মনে খেদ উদয় হইয়াছে নাকি। বল দেখি একবার শুনি।
বৃদ্ধ। কে বেহাই যে, এসো এসো। অনেক দিবস পর অদ্য আমার
পূর্ণভাগ্য, মনে পড়েছে, এসো বৈস। আর আমার দুঃখের
কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ। তা আর বল্লেই বা কি হবে।

বেহাইয়ের অনুরোধে সে পয়ার ছন্দে স্ত্রী-শূন্য জীবনের যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছে এবং বেহাই তার বিয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধের তর সয়নি, বেহাইয়ের পেছনে পেছনে তার বাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছে। বেহাইন বুড়ীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতার পর, তাকে প্রচুর অলঙ্কার দেওয়ার লোভ দিয়ে পাত্রীর সন্ধানে নিযুক্ত করেছে। টাকার সর্বগ্রাসী ক্ষমতা লেখক আগেই বলেছেন, সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে পাত্রী পেতে দেরী হয়নি ঃ

বেহাই বেহানী তার থাকে যে নগরে।
আছিল রূপসী কন্যা গৃহস্থের ঘরে ॥

* * * *

গৃহস্থে যাইয়া বলে লোভ দেখাইয়া।
বহু ধন পাইবে কন্যার বিবা দিয়া ॥
এবং তারাও— কন্যা যুক্ত বর নহে তাহা না বুঝিল।
ধনের লোভেতে দিতে স্বীকার করিল ॥

মায়ের না হোক বাপের সম্মতিতে বিয়ের পুরো আয়োজন শুরু হয়েছে। ওদিকে "সেই গৃহস্থের কুলবতী ষোড়সী, রূপবতী, সৌদামিনী, চন্দ্রাননী. বিধুবদনী, মৃগলোচনী, পিনস্তনী, গজেন্দ্রগামিনী, কুলকামিনী, চিরবিষাদিনী কন্যা অত্র বৃদ্ধ পাত্রের সহিত স্বীয় বিবাহের সংবাদ শ্রবণান্তে অতিশয় মনাগুণে দগ্ধ হইয়া জীবন যৌবন নিষ্ফল বোধ করিয়া অতিশয় চিন্তাসাগরে নিমগ্না হইয়া অশ্রুনয়নে মনে ২ রোদন করিতেছে।"

সখীরা এসে সৌদামিনীকে তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে তার আসন্ন বিপদের কথা ব্যক্ত করেছে পয়ার ছন্দে। কিন্তু 'কুলবতী ষোড়সী' বৃদ্ধ বর লাভের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়নি, 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' হয়ে গেছে।

বিয়ের পর বাসর শয্যায়—"বৃদ্ধ ব্যক্তি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গুড়ি ২ আসিয়া উক্ত শয্যায় উপস্থিত হইয়া অধৈর্য্য শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া ধীরে ২ কন্যার গায়ে হস্তক্ষেপ করিবায় কন্যা সৌদামিনী রসবতী সংগোপনে ঘোমটার ভিতর হইতে বৃদ্ধের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া মনাগুণে নিমগ্না হইয়া লজ্জিতা ভাবে সর্ব্বাঙ্গে পরিধান বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিতা হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।"

'বৃদ্ধ পতি' নিয়ে 'সৌদামিনী রসবতী'কে বেশীদিন বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়নি। পতির মৃত্যু সৌদামিনীর দুঃখ এবং পুস্তকের কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করেছে। মিলনান্ত পরিণতিতে প্রহসনটি সমাপ্ত হয়েছে: 'অতি অল্প দিবসান্তে বৃদ্ধ ব্যক্তির কাল হইলে তাবদীয় বিষয়াদী উক্ত সৌদামিনীর হস্তগত হইবায় অট্টালিকা পরে উঠিয়া উদ্যান নিরীক্ষণ করিতেছিলেন' এমন সময় এক রূপবান যুবকের সেখানে আবির্ভাব হয় এবং সখীর সাহায্যে তাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে বিধবা সৌদামিনী তার কাছে প্রেম নিবেদন করে। যুবক এই অযাচিত প্রেমে মুগ্ধ হয়। 'অতঃপর নানা উপহার দ্রব্য ভোজনান্তে উভয়ে সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ইতি।' পুস্তকটি এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' পুস্তিকায় কাহিনীগত কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অলঙ্কারবহুল, জটিল ও দীর্ঘ বাক্য এবং সহজ ও অনাড়ম্বর কথ্যরীতি উভয় প্রকার ভাষারই নিদর্শন এতে পাওয়া যায়। লেখক যে সমাজে বাস করতেন সেখানকার সমস্যাকেই তিনি প্রহসনটিতে রূপদান করতে চেয়েছেন। হয়ত কোন বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করেই কাহিনীটি রচিত হয়েছে।

পুস্তকের মধ্যে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

দীন হীন ক্ষীণ জন, করে অত্র নিবেদন,
জ্ঞানিগণে প্রণতি বচনে।
হীন আমীরদ্দী নাম, কড়েয়া গ্রামেতে ধাম,
জেন খেদ এ কাব্য রচনে॥

যে 'কড়েয়া গ্রামে'তে তিনি তাঁর 'ধাম' বলেছেন তা কি কোলকাতার কড়েয়া এলাকা? বইটির দু'জায়গায় ভণিতা দিয়ে লেখক নিজের নাম বলেছেন, 'আমিরদ্দী' ও 'আমির' :

আমিরের নাই কড়ি পতি
বল কি হইবে গড়ি।

আবার পুস্তকের শিরোনামে লিখেছেন 'শ্রী সেখ আজিমদ্দী প্রণীত'। মনে হয় আজিমদ্দী ও আমিরদ্দী উভয় নামই তিনি ব্যবহার করতেন। 'আমির' নামটি 'আমিরদ্দী'রই সংক্ষেপ। নামের পূর্বে 'শ্রী' সেকালে তো বটেই বিশ শতকের গোড়াতেও, অনেক মুসলমান লেখককে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

টাকার যে অকল্যাণকর শক্তি সমাজের সুস্থতাকে বিনষ্ট করছিল তাকেই সেখ আজিমদ্দী তাঁর ক্ষুদ্র প্রহসনে প্রকটিত করতে চেয়েছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রেমধন অধিকারীর 'চন্দ্রবিলাস নাটকে' টাকার মহিমা ব্যক্ত হয়েছে কবিতায় :

কিনা বল হয় টাকায়।
হেন কাজ নাইকো ধরায়, টাকায় যা না সাধা যায়॥
টাকাতে হাসায় কাঁদায়, ভেলকি লাগায় সব কথায়॥
টাকার জোরে আর কি বল, বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
থাকলে টাকা সবই মানে, নৈলে কেবা কথা কয়॥
পরের ছেলে টাকা পেলে, বাবা বলতে আগে চায়।
টাকার তরে সবাই পাগল, হায়রে টাকা হায়রে হায়॥"

সমাজে টাকার প্রতাপ সেদিনের সাহিত্যিকদের মনে জাগিয়েছিল বিস্ময় এবং বেদনা। টাকাওয়ালা অর্থাৎ বিত্তবান বৃদ্ধের তরুণী বিবাহের বিড়ম্বিত প্রয়াস এ-সময়ের বহু নাটক ও প্রহসনে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯ খৃঃ), দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খৃঃ) প্রভৃতি প্রহসন প্রায় একই ধরণের বিষয় অবলম্বনেই লিখিত। একজন মুসলমান লেখকও যে সে সময়ে এই সামাজিক চেতনা থেকে প্রহসন রচনা করেছেন সেইটি দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সামাজিক সমস্যা বাঙলা নাটক-প্রহসনের জন্মকাল থেকেই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। উনিশ শতকে নবলব্ধ সমাজচেতনাই নক্সা, নাটক ও প্রহসনগুলোর মূল প্রেরণা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খৃঃ), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খৃঃ) প্রভৃতি নক্সার মধ্য দিয়ে যে সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' (১৮৫৪ খৃঃ) প্রহসনে সে চেতনারই আর এক রূপ পরিলক্ষিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে কোলকাতা শহরের বিস্তৃতি এবং বিশেষ শ্রেণীর মানুষের আকস্মিক ধনবৃদ্ধি তদানীন্তন সমাজে যে কলুষ সৃষ্টি করেছিল, তা দূর করার মানসেই এ-সব রচনার জন্ম হয়। 'যে নাটকের দ্বারা সহজ সাধারণ্যে লোকশিক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে নাটকের অভিনয় দ্বারা জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই নাটকের অভিনয় দ্বারা বঙ্গ ভাষাকে পুষ্ট' করার চেষ্টা একালের সাহিত্যিকরা কত ব্যাপকভাবে করেছেন তার পরিচয় অসংখ্য ছোট বড় রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ এবং উদার দৃষ্টি শিল্পীকে দিয়েছিল আপন পরিবেশের ভাল মন্দ বিচার করার শক্তি। তাঁদের সে দৃষ্টি প্রথমেই পড়েছিল নিজ গৃহকোণের অবহেলিত নারীর প্রতি। তাঁদের চোখে ঠেকেছিল কুলীন প্রথার কদাচার, বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল, বিধবা জীবনের ব্যর্থতা এবং 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'র অন্তরবিদারী বেদনা। তাঁরা সর্বপ্রযত্নে নারী জীবনের গ্লানি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন।

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' শিল্পীর উপরোক্ত চেতনারই একটি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি।

## গল্প-কাহিনী

মীর মশারফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্য লেখকগণের মধ্যে আয়েন আলী শিকদার পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। তাঁর গদ্যপদ্যে রচিত 'বিধবাবিলাস' গ্রন্থটি ১২৭৫ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখে (২৫শে জুলাই ১৮৬৮) 'ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত' হয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের শেষে মধ্যযুগীয় পুথির রীতিতে তিনি গ্রন্থ রচনার তারিখ দিয়েছেন কবিতায়:

মিতিঅব্দ দিনমণি দক্ষিণে দক্ষনন্দিনী
ভরণী দক্ষিণ সাগরেতে।
নেত্রসনে তারিখেত কেশরী শরৎ ধাত
যুগ দিবা ভৃগু বাসরেতে॥
বিস্তারে সনের তত্ত্ব তারিখে পাইবে তথ্য
গণনায় বর্ণনা সজ্জিল।

তারিখের হেঁয়ালটি নিম্নলিখিত ভাবে সমাধান করা যায়:

দিনমণি — ১
দক্ষিণে দক্ষনন্দিনী ভরণী — ২
তার দক্ষিণে সাগর — ৭
তার দক্ষিণে নেত্র — ৩
=১২৭৩ সাল অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় দু'বছর আগে লেখক রচনা সমাপ্ত করেন।

আয়েন আলী শিকদার বরিশাল জিলার মেহেন্দিগঞ্জ পরগণার বাসিন্দা ছিলেন। পুস্তকের শুরুতে তিনি কবিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন:

বঙ্গদেশ অন্তঃপাতী বরিশাল ব্যক্তক্ষিতি
সুবিস্তৃত জেলা সুপ্রকাশ।
তার পূর্ব্বদিকে থানা মেহেন্দিগঞ্জ পরগণা
আবদুল্লাপুর নামাভাস॥
রুকুন্দি মৌজায় বাস, সাতিশয় সুপ্রকাশ
মাহাম্মদ লস্কর শিকদার।
তাঁহার প্রথম সুত, সৌভাগ্য ও গুণযুত
আবদুল রহিম শিকদার॥
তাঁহার অনুজ আমি মহাপাপী অধোগামী,
বিদ্যাবুদ্ধিহীন এ সংসারে।

'বিধবাবিলাস' গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৭ ( সাইজ ৬$\frac{৩}{৪}$" × ৪" ), দাম রাখা হয় এক টাকা। এতে একটি রোমান্টিক প্রণয়কাহিণী বর্ণিত হয়েছে।

নিশীপুর রাজ্যের রাজা গৌরীকান্ত রায় প্রতাপে 'দশানন', বিজ্ঞতায় 'বিশ্বামিত্র' এবং দানে ছিলেন 'কর্ণ'। তাঁর কিশোর পুত্র সূর্য্যকান্ত 'রূপে যেন সূর্য্যকান্ত'। একদিন সে সৈন্য সেনাপতি সঙ্গে নিয়ে 'অমীয় উদ্যানে' বেড়াতে গেল। সেখানে সে ভ্রমণ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, একদল পরী উত্তমনগরের রাজা প্রেমাদিত্যের কন্যা চন্দ্রাননীর ছবি এবং নাম ঠিকানা পটে লিখে তার শিয়রের কাছে রেখে দেয়। ঘুম থেকে উঠে সূর্য্যকান্ত একাকী চন্দ্রাননীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে 'প্রভাতে স্বসঙ্গিগণ কুমারকে অদর্শনে অতি চিন্তাযুক্ত হইয়া বহুতর তত্ত্ব করতঃ সন্ধান অভাবে সভয়ে ভূপতি সান্নিধ্যে বিজ্ঞাপন করিল। এতৎশ্রবণে রাজা এবং রাজ্ঞী অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া রোদন করতঃ দূতগণকে দ্রুততর দেশ দেশান্তরে অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন।' ওদিকে পরীরা সূর্য্যকান্তের ছবি পটে এঁকে চন্দ্রাননীর শিয়রের কাছে রেখে এসেছে। সে রাজকুমারের ছবি দেখে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যেতে লাগলো। রাজা ও রাণী মেয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বহু চিকিৎসা করেও কোন ফল হোল না।

অনেক সন্ধানের পর সূর্য্যকান্ত উত্তমনগরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে তারাপ্রিয়া নামে এক 'নাপিত জাতীয়' বৃদ্ধার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছে। তারাপ্রিয়া তার কাছে রাজকন্যার অসুস্থতার সংবাদ এবং তার অপরূপ রূপের বিবরণ দিয়েছে। চন্দ্রাননীর ঃ

গৃধিনী গঞ্জিত কর্ণ মুকুতারঞ্জিত।
বিম্ব ওষ্ঠাধর পদ্ম যেন প্রকাশিত ।।
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ।
বেণী ফণী মণি সহ গৌরবা গৌরব ।।

রাজপুত্র নিজেকে 'বৈদ্য' বলে পরিচয় দিয়ে, রাজার কাছে চন্দ্রাননীর চিকিৎসা করার অনুমতি চেয়েছে। চিকিৎসাচ্ছলে তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়েছে। রাজকন্যা ক্ষণিক দর্শনে আরও বিচলিত হয়েছে 'চন্দ্রাননী নাগরমণিকে অদর্শনে মণিহারা ফণীর ন্যায় সকাতরা, বিয়োগিনী ও মন্মথশরে মর্ম্মভিন্না হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সঙ্গিনীকে কহিলেন, "ওগো প্রাণ সখি। কি অপরূপ রূপই

হেরিলাম। বুঝি সেই গুণমণি এই প্রিয়তম গুণমণিই বটেন, যখন আবার নয়ন সংযোগে ও নয়ন হেরিলাম, তখন তাহার যুগল নয়ন ঘূর্ণন কটাক্ষে লোমাঞ্চিত অঙ্গ ও উন্মাদিনীবৎ অচেতনা হইলাম। আহা! ইচ্ছা হইতেছে, সতত সেই রূপ দর্শন করি"। সখী সরলা তাকে প্রবোধ দিয়েছে "অগো, রাজকুমারী! এত ক্ষিপ্ত হলে কেন? নিদাঘ আর কি থাকে, নীরদ ডাকে, এখন বর্ষিত হইবেই হইবে, কিয়ৎ-কাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" শেষ পর্যন্ত সখিদের চেষ্টায় চন্দ্রাননীর সঙ্গে সূর্য্যকান্তের গোপনে 'গান্ধর্বিবাহ' হয়েছে। পুষ্পোদ্যানে তাদের গোপন প্রেমালাপ রাণী দেখে রাজার কাছে বলেছেন। রাজা 'তুমুল ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অবিলম্বে কোটাল'কে চোর ধরার জন্য আদেশ দিয়েছেন। ফলে, তাদের গোপন মিলন বন্ধ হয়ে গেছে এবং রাজকন্যা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিয়েছেন:

কেবল তরুণকালে রণ্ডা হল যে সকলে
তা সবেরে আনিয়া সংপ্রতি—
রাখুন কুমারী সঙ্গে ধৈর্য্য হবে রঙ্গে ভঙ্গে
তাহাদের বৈধব্যতা হেরি॥

কিন্তু এতে বিপরীত ফল হয়েছে। বিধবারা চন্দ্রাননীর কাছে তাদের দুঃসহ বিরহযন্ত্রণা এবং উপপতি সম্ভোগের বিবরণ দিয়েছে। শুনে রাজকন্যার 'বিরহ বিকার' গেছে বেড়ে। শেষে বাধ্য হয়ে রাজা আদেশ প্রচার করেছেন: 'যেহেতু সংপ্রতি অনুসন্ধানে তোমাকে হাজির পাওয়া যাইতেছে না, এই নিমিত্তে তোমাকে জানান যাইতেছে যে তুমি যে রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলে তাহার আরোগ্য হইয়াছে। অতএব তোমার প্রতি অভয় প্রদান পূর্ব্বক এই আদেশ করা যাইতেছে যে পুরস্কারার্থে যাহা স্পৃহান্বিত হও, মহারাজের সন্নিধানে অগৌণ উপস্থিত হইলে তাহা প্রাপ্ত হইয়া মানস পূর্ণ করিতে পারিবে।'

রাজার অভয় পেয়ে সূর্য্যকান্ত রাজসভায় উপস্থিত হয়েছে এবং রাজা তার সঙ্গে চন্দ্রাননীর বিয়ে দিয়েছেন। তারা পরম আহ্লাদে পরস্পরকে মধুর সম্ভাষণ করে দিন কাটিয়েছে:

"যুবরাজ প্রেয়সীর পীযূষ বাক্য শ্রবণে হাস্যাননে প্রীতিবচনে কহিলেন ওগো প্রেয়সী। নিশামণি করস্পর্শনে রজনী যোগে কুমুদিনী আহ্লাদিণী প্রস্ফুটিতা, মন্দ মন্দ মলয়জ বহিতেছে। তখন চন্দ্রাননী বলিলেন ওহে প্রাণকান্ত। এই ক্ষণ ভোজন সময়, সখীগণ সম্মুখবর্তিনী নানা উপহার যুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, আসনে

উপবেশন পূর্ব্বক আহারীয় ভক্ষণ করুন। যুবরাজ হৃষ্টমনে ভোজনান্তরে আচমন করিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। তৎপর মনোরম্য পালঙ্গে বসিলে যুবতী ভোজনান্তর সহর্ষমনে ভর্ত্তার নিকটে অকপটে হাস্যমুখে বাম পার্শ্ববর্ত্তিণী হইলেন। তদ্দর্শনে যুবরাজ আহ্লাদপূর্ব্বক প্রেমাদরে পালঙ্গে বসাইলেন। উভয়ে কৌতুক হাস্য পরিহাসপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।"

শ্বশুর বাড়ীতে কিছু কাল থাকার পর সূর্য্যকান্ত স্ত্রীকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরেছে। রাজা তার হাতে রাজ্যভার দিয়ে তীর্থযাত্রা করেছেন। কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে।

আমরা এ পর্যন্ত যে সব সাহিত্যিকের পরিচয় দিয়েছি তাদের মধ্যে খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহাম্মদ সিদ্দিকী ও আয়েন আলী শিকদার ছাড়া বাকী সকলেরই ভাষা প্রধানত কথ্য এবং তাঁদের সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় সমসাময়িক কালের বাস্তবসমাজ ও তার বিবিধ সমস্যা। সমাজ সম্পর্কে তাঁদের তীক্ষ্ণ সচেতনতা ছিল বলেই তারা দেখেছিলেন: 'এখন পুরুষরা আর মেয়েদিগকে কিছু রুষ্ট বাক্য বলিতে পারে না।'

তাঁরা জানতেন, এক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে যারা, তারা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্য আস্বাদন করে: 'রসবতী সতী যদি হেসে কথা কয়। তুচ্ছ হয় স্বর্গপুরী প্রিয় সে সময়।'

আবার বহুবিবাহের ফলে বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনে 'অসময়ে কেহ কার না হয় দোসর।'

তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের মধ্যে দেখেছিলেন, তারা 'চুরি ও লোচ্চামী আর করে মদ্যপান।'

সেদিনের সমাজের মধ্যে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন: 'আমার গ্রামেতে বড় শিয়াল মহাশয়। বড়ই দুষ্ট জোয়ে পেলে কুকড়া ধরে খায়।'

কলিকালের সমাজে মানুষের মূল্য ও মর্যাদাকে বিপর্যস্ত হতে দেখে, তাঁরা আক্ষেপ করেছিলেন: 'ভদ্রের ভদ্রত্ব গেল ছুছোঁ হইল বাবু।'

কারণ, তখন সমাজের মধ্যে 'হাড়িতে উড়ায় শাল মেতরে আতোর। দিনেতে মোল্লাজী হন রাত্রে নেশাখোর।'

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষকে তাঁরা 'সজনাসাক কলমিলতা সিদ্ধ' খেতে দেখেছিলেন। দেশের দুর্দশা নিয়ে ব্যবসা করে স্ফীত হোত 'টৌনাগঞ্জি'র দল। মওকা ফস্কে গেলে

তাদের যে আক্ষেপ তাকেও তাঁরা শুনেছিলেন : ‘আহা বাইরে বাই আর কও নারে বাই আমারে মারছে।’

‘কলির বউ’ সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনায় স্বার্থপর হয়ে উঠতো। তারা স্বামীকে ‘ক্রমে ২ কাবু’ করে ফেলতো এমনভাবে যে, স্বামীরা তাদের কথায়, ‘ওঠ বল্লে ওঠেন বস বল্লে বসেন’। তারপর একদিন তরুণী বধূর ষড়যন্ত্রে বৃদ্ধ পিতামাতা সংসারের কর্তৃত্ব হারিয়ে পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন, তখন ‘বাপ বলে বেটা কেটা, বেটা বলে কে ওটা’।

সর্বোপরি তাঁরা জানতেন, সুখে দুঃখে আন্দোলিত, ভয়ে ভাবনায় পরিপূর্ণ ‘এই যে সংসারখানা দেখিতে পাও এ কম নয়, এই স্থানেই স্বর্গমর্ত্য পাতাল এই স্থানেই পাপ পুণ্য,।

এক কথায়, একালের মুসলমান সাহিত্যিকদের মন ছিল সজাগ, দৃষ্টি ছিল প্রসারিত এবং সর্বব্যাপী মানুষের কল্যাণসাধনের কামনা তাঁদের অন্তরে ছিল জাগ্রত। হয়ত সমাজের প্রতিকূল অবস্থার জন্যই তাঁদের প্রয়াস সার্থকতার পথ পায়নি এবং তাঁদের দ্বারা ব্যাপক আকারে সাহিত্যচর্চাও সম্ভব হয়নি।

আমাদের কালে এসব সাহিত্যিকদের সম্পর্কে এক ধরণের পণ্ডিতদের মধ্যে উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দুর্লভ নয়। তাঁরা আমাদের এই অতি অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকদের রচনাকে অকিঞ্চিৎকর, মূল্যহীন ও হেয় প্রমাণ করাকেই তাঁদের পাণ্ডিত্যের চরম কৃতিত্ব জ্ঞান করে থাকেন। হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে কেউ কেউ আবার এ-সব সাহিত্যের মহিমা অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গেই প্রচার করে থাকেন। আমরা তার প্রশংসা করি না। কিন্তু এ-কথা আমরা আমাদের সাহিত্য-রসিকদের ভেবে দেখতে বলি যে, এঁরা যা করেছেন তাকে ভিত্তি করেই আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

চারপাশের মানুষের জীবনকে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখার ও সেই জীবনের ভাল এবং মন্দ, আনন্দ এবং বেদনাকে রূপায়িত করার যে অপরিসীম কৌতূহল আধুনিক কালের শিল্পীচিত্তকে অস্থির করে তুলেছিল, যার প্রকাশ অসংখ্য প্রহসন নক্সা এবং নাটকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন পুস্তিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। এসব রচনায় সাহিত্য সৃষ্টির যে ব্যাকুল প্রয়াস স্তূপীকৃত হয়ে আছে তাতে ফুৎকার দিয়ে হয়তো শিল্পের কোন স্ফুলিঙ্গ আজ আর আবিষ্কৃত হবে না, কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হলেও চলবে না যে, এরই উপর অম্লান শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে আছে আমাদের আধুনিক বাঙলা সাহিত্য।